জানুয়ারি ২০২৬ ■ পৌষ-মাঘ ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

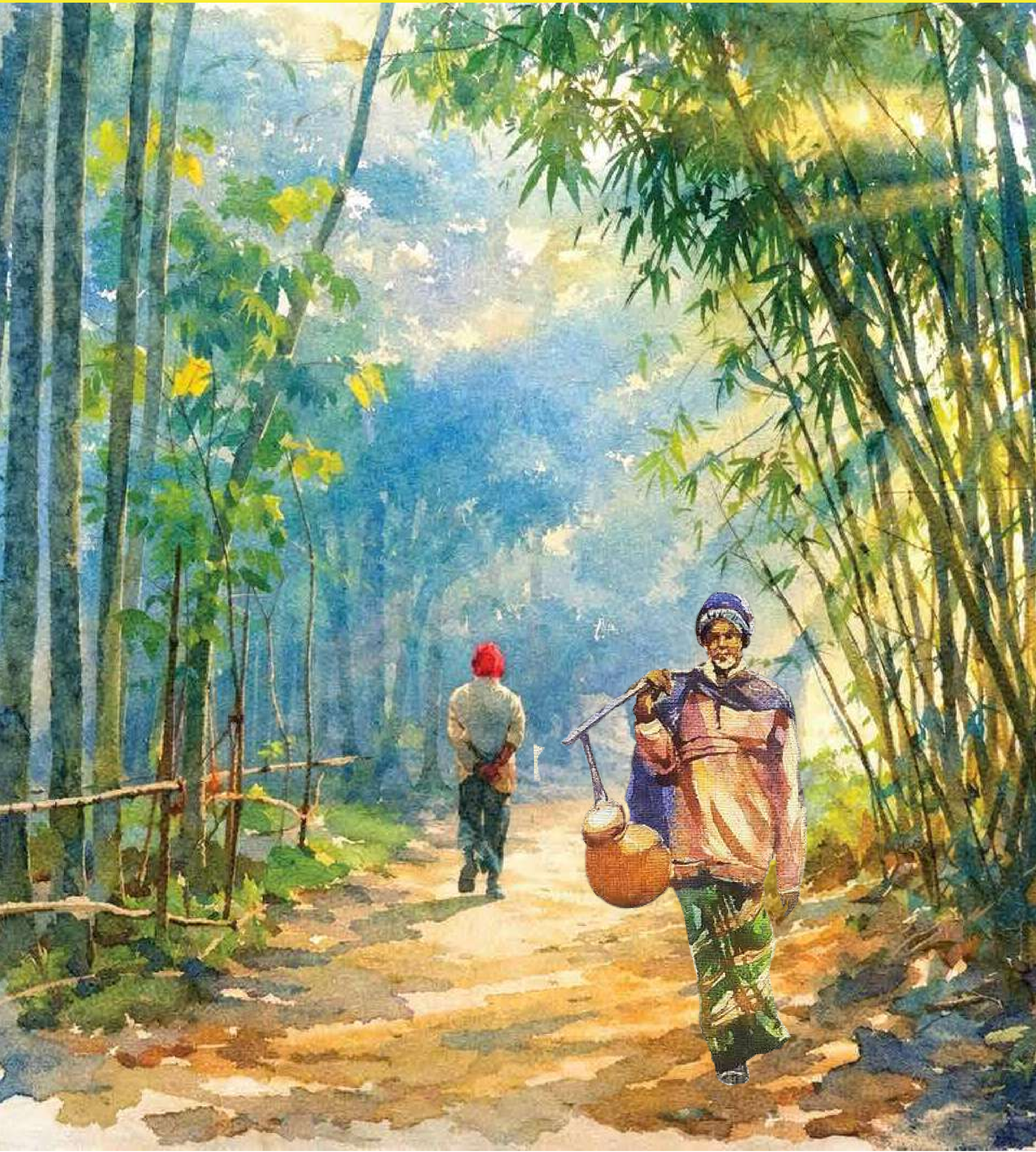

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

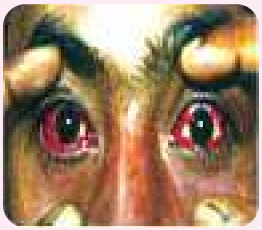
হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

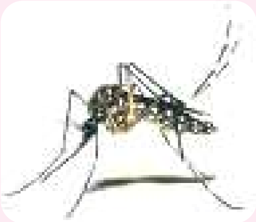
এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জানুয়ারি ২০২৬ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪৩২

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ২১শে জানুয়ারি ২০২৬ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ইতালির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট (ডেপুটি মিনিস্টার ফর ডিফেন্স) Matteo Perego di Cremnago সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। জনগণ ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রপ্রেমী সংগ্রামী বাঙালি জাতি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে উন্মুখ। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন এবং একই সাথে জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫-এর উপর গণভোট ২০২৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১১ই ডিসেম্বর ২০২৫ জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

তিনি ভাষণে বলেন, জাতি হিসেবে আমাদের অমোঘ শক্তি হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য আমাদের ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল মালিকানা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন। এবারের নির্বাচন আমাদের জাতির ইতিহাসে অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ। ভোট আপনার শুধু নাগরিক অধিকারই নয় বরং পবিত্র আমানত ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সচেতনভাবে আপনারা পালন করবেন– এ আমার বিশ্বাস।

তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন– যে-কোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংকোচে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনাদের নিরাপদ ও উৎসবমুখর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী কাজ করবে। তিনি আশাবাদী, ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোটের অনুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ তুলে ধরা হলো।

শীতকালের কুয়াশার চাদরে মোড়া সকালে এক ফালি রোদ সকলের কাছে বহুল প্রতীক্ষিত। একটি ভিন্ন আমেজ তৈরি হয় এই শীতকালে। শীতে সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই থাকলেও সকালের দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। শীতকালে নানারকম শাকসবজি জন্মায়। শীতকালে চড়ুইভাতি করে। শীতে বনভোজন, শীতকালীন মেলা বিশেষ করে পিঠা-মেলার ধুম পড়ে যায়। তবে বয়স্ক ও শিশুরা শীতের তীব্রতা সহ্য করতে না পারায় নানা রোগে আক্রান্ত হয়। সচেতনতা এবং কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে তাদেরকে স্বাভাবিক রাখা যায়। শীত আসে আমাদের প্রকৃতিকে বদলে দিতে। শীত নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ।

নদী-নালা, খাল-বিল আর হাওরবাঁওড়ে ভরা বাংলাদেশ। হাওরবাঁওড় এবং বিল-ঝিলে থাকা আবাসিক পাখি ও শীতকালে আসা রং-বেরঙের পরিযায়ী পাখির ডানা ঝাপটানো আর মুখরিত কলতানে মুগ্ধ হন পাখিপ্রেমীরা। শীতকালে বরফে আচ্ছাদিত থাকা অঞ্চলের পাখিরা জীবন বাঁচাতে হাজার কিলোমিটার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। এসব পরিযায়ী পাখির অবদান অসামান্য। এসব পাখি ক্ষতিকর পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। এতে ফসলের উপকার হয়। সাহায্য করে ফুল এবং শস্যের পরাগায়নে। উর্বরতা বাড়ায়। ভালো হয় ফসলের ফলনও। মাটিতে জন্মায় নতুন নতুন গাছের চারা, যা প্রকৃতিকে করে তোলে সবুজ। আনে বৈচিত্র্য। পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ ও নিবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এবারের সংখ্যা। আশা করি, জানুয়ারি ২০২৬ সংখ্যাটি পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/নিবন্ধ/গ্রন্থ আলোচনা/বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) ভাষণ ৪

আচরণবিধি ২০২৫ : পোস্টারমুক্ত নির্বাচনের পথে বাংলাদেশ ৭
মো. মামুন অর রশিদ

অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটাধিকার বাস্তবায়নে আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট ১০
মো. খালিদ হাসান

বেগম খালেদা জিয়াঃ মৃত্যুঞ্জয়ী এক মহীয়সী ১২
হাসান হাফিজ

গৃহবধূ থেকে আপোশহীন নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৫

আমাদের পরিযায়ী পাখি ১৭
ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

বাংলাদেশের শীত আর কবিতা ২১
কাজী আলিম-উজ-জামান

মধুসূদনের কাব্য ও প্রজন্মের প্রেরণা ২৪
প্রফেসর ড. সবুজ শামীম আহ্‌সান

বাংলা সাহিত্য নিয়ে কবি জসীমউদ্‌দীনের ভাবনা ২৮
ড. কুদরত-ই-হুদা

শীতকালীন উৎসব ও গ্রামীণ মেলা ৩০
মাসুম আওয়াল

শীতের সবজিঃ উপকারিতা ও সতর্কতা ৩৩
লিনা আকতার

কুয়াশায় মোড়ানো শিশির জড়ানো শীত ৩৬
আলম শামস

বাংলাদেশের তারুণ্যের শক্তি উন্নয়নের বাতিঘর ৪০
খান চমন-ই-এলাহি

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন ৪৪
গোলাম সাকলায়েন

শীতকালে বয়স্ক ও শিশুদের যত্ন ৪৭
ডা. তানজিদা রহমান

নগরজীবনে মানসিক স্বাস্থ্যঃ চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৪৯
মো. মোস্তাক আহমেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শেষের কবিতা*ঃ প্রেম, স্বাধীনতা ও বাস্তববোধের অনন্ত সংলাপ ৫১
আজহার মাহমুদ

কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার ৫৩
সুজন শাহরিয়ার

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম জানুয়ারি ২০২৬ ৫৫

গল্প

নিয়তি ৫৮
অদ্বৈত মারুত

গল্পে গল্পে শীত ৬০
আতিক রহমান

কবিতা

৬২-৬৩
গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, আবু রুশদা, রাকিবুল ইসলাম রাহান, মেহেরুন ইসলাম, বাবুল তালুকদার, কাজল নিশি, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন প্রথিতযশা ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া ৬৪

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) ভাষণ

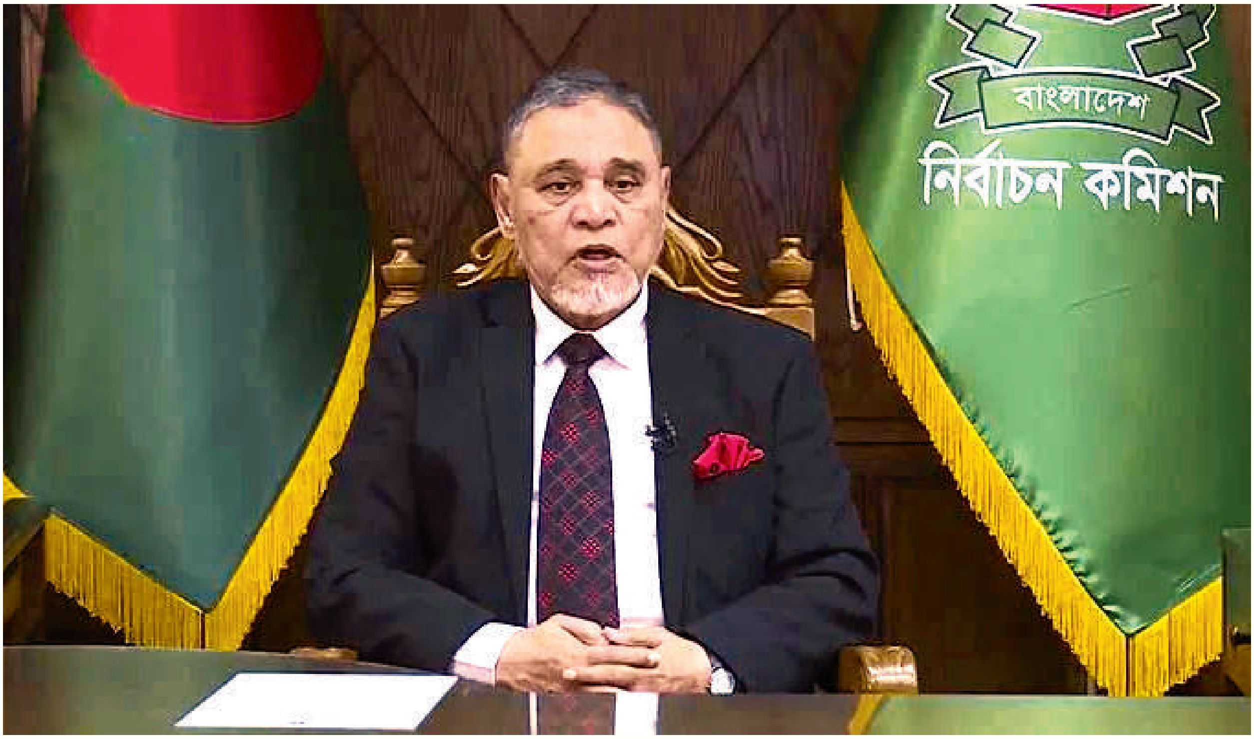

জাতির উদ্দেশে ভাষণের মাধ্যমে ১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। তাঁর ভাষণের পূর্ণবিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো—

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম,

মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া তিনি বহু প্রতীক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫-এর উপর অনুষ্ঠিতব্য গণভোটের তফসিল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। বক্তব্যের শুরুতেই মহান বিজয় দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীকে জানাই অগ্রিম শুভেচ্ছা। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। একই সাথে জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধা এবং তাদের আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করছি। মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার সকল আন্দোলনে যারা আহত, নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য এবং স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতি হিসেবে আমাদের অমোঘ শক্তি হচ্ছে— স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য আমাদের ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ। জাতির প্রত্যাশাকে ধারণ করে আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রের উপর জনগণের একচ্ছত্র মালিকানা নিশ্চিত করেছে। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল মালিকানা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে মানসম্মত নির্বাচনের অনুপস্থিতি প্রায়শই আমাদের ঐতিহ্য এবং সামষ্টিক প্রত্যাশাকে ম্লান করেছে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে আমাদের ভাইবোন সন্তানদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে। আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠান যা জাতি হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং বিশ্ব দরবারে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা একই প্রত্যাশা ধারণ করেন এবং একই অঙ্গীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রিয় দেশবাসী,

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে গত এক বছরে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছি। একটি স্বচ্ছ নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা। আমরা শুরুতেই এ কাজে হাত দেই। গত এক বছরে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি ভোট বিমুখ এবং বাদ পড়া প্রায় ৪৫ লক্ষ ভোটারকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ২১

লক্ষাধিক মৃত ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নারী ভোটারদের যথাযথ অন্তর্ভুক্তির অভাবে পুরুষের সাথে নারী ভোটারের ব্যবধান বেড়ে প্রায় ২৯ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। বাদ পড়া নারী ভোটারদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সেই ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা হয়েছে। আইন সংশোধন করে ভোটার হওয়ার যোগ্যতার তারিখ প্রতিবছর পহেলা জানুয়ারির পরিবর্তে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত দিনে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে ৩১শে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত যোগ্য তরুণ ভোটারগণ ভোট দিতে পারছেন। গত ১৮ই নভেম্বর প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৮৩ জনে। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৯০৭ জন এবং নারী ভোটারের সংখ্যা ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪২ জন। গত এক বছরে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহি বাড়াতে আমরা বহুবিধ আইনি ও কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করেছি। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণবিধিতে যথাযথ পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব মূল্যায়ন ও অংশীজনের পরামর্শের ভিত্তিতে এসব সংস্কার করা হয়েছে। এই উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার জন্য আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনসহ সকল অংশীজনদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় দেশবাসী,

বিভিন্ন কারণে এবারের নির্বাচন আমাদের জাতির ইতিহাসে অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত সংস্কার প্রশ্নে সিদ্ধান্তের নির্বাচন এটি। এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে, যা একটি নতুন অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়ত সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই নির্বাচন হচ্ছে সক্ষমতা প্রমাণ করে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের অনন্য সুযোগ। তৃতীয়ত দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের পর দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক দলসমূহের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ধারা প্রবর্তনের দাবি রাখে এই নির্বাচন। চতুর্থত প্রায় অকার্যকর পোস্টাল ভোট ব্যবস্থাকে পরিমার্জন করে এই নির্বাচনে একটি রূপ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্যতম চালিকাশক্তি আমাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা তথা প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের প্রথমবারের মতো ভোটের আওতায় আনা হচ্ছে। একইভাবে প্রথমবারের মতো ভোটের আওতায় আসছেন আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারগণ। এছাড়াও নিজ নির্বাচনি এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি কর্মচারী এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এবার ভোট দেবেন।

প্রিয় ভোটারবৃন্দ,

ভোট আপনার শুধু নাগরিক অধিকারই নয় বরং পবিত্র আমানত ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সচেতনভাবে আপনারা পালন করবেন এ আমার বিশ্বাস। যে-কোনো ভয়ভীতি, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা এবং সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে নিঃসংকোচে আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনাদের নিরাপদ ও উৎসবমুখর অংশগ্রহণ নিশ্চিত কল্পে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও বাহিনী কাজ করবে। ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে এই আনন্দ আয়োজনে অংশগ্রহণ করুন। পরিবারের প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও সন্তানসম্ভবা মা-সহ সকলকে নিয়ে ভোট দিতে আসুন। আমি আশা করি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোটের অনুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেবে। প্রবাসে বসবাসরত প্রিয় ভোটারগণ প্রবাস থেকে ভোটদানের জন্য নিবন্ধন কার্যক্রম গত ১৮ই নভেম্বর থেকে চলমান আছে। আগামী ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে পৃথিবীর যে-কোনো স্থান থেকে ভোটদানের জন্য আপনারা নিবন্ধন করতে পারবেন। আপনারা এই সুযোগ গ্রহণ করে ভোটে অংশ নিন। দেশ গঠনে আপনাদের অধিকার বুঝে নিন। প্রবাসী ভোটারগণ ছাড়াও দেশের ভিতরের তিন ধরনের ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। প্রবাসী ভোটারগণের পাশাপাশি এই তিন ধরনের ভোটারগণ আগামীকাল থেকে শুরু করে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ-এর মাধ্যমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন। ব্যক্তি, ভোটার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আমার আহ্বান আসুন আমরা আমাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করি এবং ভোটে অংশ নেই।

প্রিয় দেশবাসী,

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অসত্য তথ্য ও অপতথ্যের বিস্তার দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। প্রতিপক্ষ দল ও প্রার্থীকে হেয় করার পাশাপাশি নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচারণা আমাদের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করে এবং নির্বাচনকে কলুষিত করে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এসব রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ অসত্য এবং অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত কোনো তথ্যে কান দিবেন না, গ্রহণ করবেন না। মনে রাখবেন

অসত্য তথ্য শেয়ার করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমি এবার নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থী এবং দলসমূহের প্রতি দু'একটি কথা বলতে চাই। আসুন আমরা আচরণবিধি মেনে একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন নিশ্চিত করি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে ভোটারদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনই হোক আপনাদের লক্ষ্য।

নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। কমিশনের অংশ হিসেবে আপনারা নির্ভয়ে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। মনে রাখবেন এ ব্যাপারে কোনো শিথিলতা বা গাফিলতি সহ্য করা হবে না। একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যম ও পর্যবেক্ষক সংস্থার সহকর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। আপনারা স্বাধীনভাবে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সাথে আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন— এটি আমাদের প্রত্যাশা।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি এ পর্যায়ে নির্বাচনি তফসিল তথা নির্বাচন সংক্রান্ত সময়সূচি ঘোষণা করছি। আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ৩০০ আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন এবং একই সাথে জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫-এর উপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ২৯শে ডিসেম্বর ২০২৫ রোজ সোমবার, মনোনয়ন পত্র বাছাই হবে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৫ রোজ মঙ্গলবার হতে ৪ঠা জানুয়ারি ২০২৬ রোজ রবিবার পর্যন্ত। রিটার্নিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ ১১ই জানুয়ারি ২০২৬ রোজ রবিবার, কমিশনে দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তির তারিখ ১২ই জানুয়ারি ২০২৬ রোজ সোমবার থেকে ১৮ই জানুয়ারি ২০২৬ রোজ রবিবার পর্যন্ত, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০শে জানুয়ারি ২০২৬ রোজ মঙ্গলবার, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ ২১শে জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রোজ বুধবার। নির্বাচনি প্রচারণা চলবে ২২শে জানুয়ারি ২০২৬ রোজ বৃহস্পতিবার হতে ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত তথা আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রোজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ ভোটারদের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি সকলের প্রতি আমার আহ্বান আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সফল করে আমাদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখুন।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

[সূত্র: বাসস]

আচরণবিধি ২০২৫ : পোস্টারমুক্ত নির্বাচনের পথে বাংলাদেশ

মো. মামুন অর রশিদ

পোস্টার আর নির্বাচন— দীর্ঘদিনের সহযাত্রী। নির্বাচন মানেই ছিল পোস্টারের ছড়াছড়ি। নির্বাচনের সময় হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, দোকান কিংবা দেয়াল— সবকিছু ছেয়ে যেত পোস্টারে। বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সংবলিত সেসব পোস্টার ছিল নির্বাচনের দৃশ্যমান ভাষা। সময়ের সঙ্গে সেই চেনা দৃশ্য এখন বদলে যাচ্ছে। নির্বাচনের সঙ্গে পোস্টারের সেই সম্পর্ক এখন শুধুই স্মৃতি। কারণ আসন্ন সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে পোস্টারহীন— যেখানে প্রচারের ভাষা খুঁজবে নতুন রূপ, নতুন মাধ্যম।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে যে-কোনো ধরনের পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধসহ আরো কিছু নতুন বিধিনিষেধ সংযুক্ত করে নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। বিধিমালার নাম দেওয়া হয়েছে 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫', যা গত ১০ই নভেম্বর গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৫ পৃষ্ঠার এই বিধিমালায় ৩১টি বিধি ও দুইটি তফসিল রয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা নির্বাচনের সময় কী কী করতে পারবেন, আর কী কী করতে পারবেন না— সেসব বিষয় এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিধিমালার বিধি-৪ অনুযায়ী, কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কিংবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে (তফসিল ঘোষণার দিন থেকে নির্বাচনের ফল গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত) নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অন্যত্র অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার চাঁদা, অনুদান বা উপহার প্রদান করতে বা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমিতি বা সংগঠন হতে কোনো প্রকার সংবর্ধনা গ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া, কোনো প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোনো সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোনো প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করতে পারবেন না।

বিধি-৫ অনুযায়ী, সরকারি ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার কিংবা এ উদ্দেশ্যে অবস্থান করা যাবে না।

বিধি-৬-এ বলা হয়েছে, প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী সমান অধিকার পাবেন, তবে প্রতিপক্ষের জনসভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পণ্ড কিংবা তাতে বাধা প্রদান বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু করতে পারবেন না। নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পূর্বে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির প্রস্তাব প্রদান করতে হবে। একই স্থানে ও একই সময়ে একাধিক দল বা প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা সমন্বয় করবে।

কোনো প্রার্থী জনসভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে জনসভার স্থান ও সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থানে চলাচল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো স্থান, সড়ক, মহাসড়ক ও জনপথে জনসভা, পথসভা কিংবা কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ করা যাবে না। এছাড়া, কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে কোনো প্রকার জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান বা কোনো প্রকার প্রচার-প্রচারণা করতে পারবেন না।

বিধি-৭-এ উল্লেখ রয়েছে, নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না। প্রচারণায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপচনশীল দ্রব্য যেমন : রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি কোনো প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না। একই সঙ্গে ব্যানার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে পলিথিনের আবরণ ব্যবহার করা যাবে না।

কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহ এবং বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিকশা, অটোরিকশা, লেগুনা, ট্যাক্সি, বেবিটেক্সি বা অন্য কোনো যানবাহনে কোনো প্রকার লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন সাঁটাইতে পারবে না। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ডের উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড টাঙানো যাবে না। এছাড়া, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ডের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা

বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাবে না।

ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যতীত নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহার্য ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন সাদা-কালো রঙের হতে হবে। ব্যানার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট এবং প্রস্থ ৪ ফুটের বেশি হওয়া যাবে না। লিফলেট বা হ্যান্ডবিল এ৪ সাইজের (৮.২৭ ইঞ্চি × ১১.৬৯ ইঞ্চি) চেয়ে বড়ো করা যাবে না। ফেস্টুনের দৈর্ঘ্য হবে অনধিক ২৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ অনধিক ১৮ ইঞ্চি। ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুনে প্রতীক, নিজের ছবি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের ছবি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপানো যাবে না।

বিধি-৮ অনুযায়ী, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে পারবে, তবে তাতে প্রার্থীর নাম, ছবি, পদের নাম, প্রতীক কিংবা ভোট প্রার্থনা-সংক্রান্ত কোনো কিছু উল্লেখ করা যাবে না।

বিধি-৯-এ উল্লেখ রয়েছে, নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো বাস, ট্রাক, নৌযান, মোটরসাইকেল কিংবা অন্য কোনো যান্ত্রিক বাহন সহকারে কোনো মিছিল, জনসভা কিংবা কোনোরূপ শোডাউন করা যাবে না। একই সঙ্গে নির্বাচনি প্রচারে যানবাহন সহকারে কিংবা যানবাহন ব্যতীত কোনো ধরনের মশাল মিছিল করা যাবে না। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ও কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করা যাবে না। এছাড়া, নির্বাচনি প্রচারণা এবং ভোটগ্রহণের সময় কোনো প্রকার ড্রোন, কোয়াডকপ্টার বা এরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।

কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি দেয়ালে লিখে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবেন না (বিধি-১১)। এছাড়া, নির্বাচনি প্রচারণায় প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না (বিধি-১২)।

বিধি-১৩ অনুযায়ী, নির্বাচনি প্রচারণার জন্য কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করতে পারবে না। চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো সামগ্রী স্থাপন বা কোনো স্থাপনা নির্মাণ করাও যাবে না। নির্বাচনি প্রচারণায় কেউ ৪০০ বর্গফুটের অধিক স্থান নিয়ে কোনো প্যান্ডেল তৈরি করতে পারবেন না। প্রচারণার অংশ হিসেবে কোনো প্রকার আলোকসজ্জাও করা যাবে না।

বিধিমালায় নির্বাচনি বিলবোর্ডের পরিমাপও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিলবোর্ডের দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুটের বেশি হবে না। সংসদীয় আসনের প্রত্যেক ইউনিয়ন বা পৌরসভা অথবা মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রতি একটি অথবা সমগ্র নির্বাচনি এলাকায় ২০টি; যা অধিক হয়, তার অতিরিক্ত বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে না (বিধি-১৪)।

বিধি-১৫ অনুযায়ী, নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা, অশালীন এবং আক্রমণাত্মক বা ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বক্তব্য দেওয়া যাবে না। কোনো ধরনের তিক্ত, উস্কানিমূলক, মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন বক্তব্যও পরিহার করতে হবে। মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় এবং কোনো সরকারি অফিস বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালানো যাবে না। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কেউ কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেউ কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা লাঠি বা দেশীয় কোনো ধারালো বা ভোঁতা অস্ত্র বহন করিতে পারবেন না।

অনলাইন প্রচারণার ক্ষেত্রে কোনো প্রার্থী কিংবা তার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা সংশ্লিষ্ট কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে নির্বাচনি প্রচারণা করতে পারবে (বিধি-১৬)। সেক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নাম, অ্যাকাউন্ট আইডি, ই-মেইলসহ শনাক্তকরণ তথ্য প্রচার-প্রচারণার পূর্বে রিটার্নিং

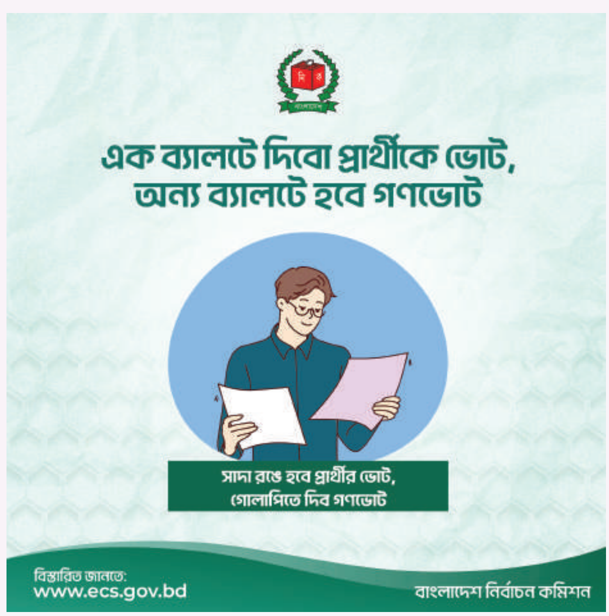

কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হবে। সত্যতা যাচাই ব্যতিরেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচন-সংক্রান্ত কোনো কনটেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করা যাবে না। প্রচার-প্রচারণাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া, ঘৃণাত্মক বক্তব্য, ভুল তথ্য, কারও চেহারা বিকৃত করা ও নির্বাচন-সংক্রান্ত বানোয়াট তথ্যসহ কোনো প্রকার ক্ষতিকর কনটেন্ট (আধেয়) তৈরি ও প্রচার করা যাবে না।

নির্বাচনি প্রচারণায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২টা হতে রাত ৮টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। নির্বাচনি প্রচারকার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ ডেসিবেলের অধিক হওয়া যাবে না (বিধি-১৭)।

ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করা যাবে না। এছাড়া, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে নির্বাচনি প্রচারণা সমাপ্ত করতে হবে (বিধি-১৮)। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনি এলাকায় ব্যবহৃত নিজ নিজ প্রচারণা সামগ্রী প্রার্থীকে নিজ দায়িত্বে অপসারণ করতে হবে (বিধি-১৯)।

বিধি-২০ অনুযায়ী, সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ তাদের সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে কোনো নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড যোগ করতে পারবেন না। সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তালিকায় এবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদেরও যুক্ত করা হয়েছে। ফলে তারা কোনো প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না। কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা কোনোরূপ সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না (বিধি-২১)।

কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ নির্ধারিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করতে পারবেন না। নির্বাচনি ব্যয় রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা এবং প্রার্থীর ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে হলে তা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকিং মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা বাবদ ব্যয়সমূহ প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়সীমার অন্তর্ভুক্ত হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণায় বিদেশি অর্থায়নে বিজ্ঞাপন প্রদান বা প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না (বিধি-২২)।

ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং ভোটারদের প্রবেশাধিকার থাকবে। ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ বা ঘুরাঘুরি করতে পারবেন না (বিধি-২৩)।

বিধি-২৪ অনুযায়ী, প্রতীক বরাদ্দের পর পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনি প্রচারণার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার একই মঞ্চে সকল প্রার্থীদের উপস্থিতিতে তাদের নির্বাচনি ইশতেহার পাঠ এবং আচরণবিধি প্রতিপালনের ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫’-এর বিধি-২৭-এ বিধিমালা লঙ্ঘনের শাস্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই অপরাধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৬ মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। এছাড়া, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই অপরাদের জন্য উক্ত রাজনৈতিক দল অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করতে পারবে।

রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যাতে আচরণ বিধিমালা মেনে চলে সেজন্য অঙ্গীকারনামা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। আচরণ বিধিমালায় এ-সংক্রান্ত দুটি তফসিল যুক্ত করা হয়েছে।

নির্বাচনি আচরণবিধি কেবল কিছু নিষেধাজ্ঞার সমষ্টি নয়; এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত। নির্বাচনি ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে আচরণবিধিতে নতুন কিছু বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। এই আচরণ বিধিমালার সফল প্রয়োগ নির্ভর করবে প্রশাসন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছার ওপর। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আসন্ন সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে— এমনটাই প্রত্যাশা।

মো. মামুন অর রশিদ: উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)

অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটাধিকার বাস্তবায়নে আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট

মো. খালিদ হাসান

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো সর্বস্তরের নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কিন্তু জীবিকা, কর্মসংস্থান কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের কারণে দীর্ঘদিন ধরে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে অবস্থানরত নাগরিকদের একটি বড়ো অংশ বাস্তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রশাসনিক সক্ষমতার সমন্বয়ে সেই দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ সামনে রেখে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার কার্যকর ও সহজ করতে যুগোপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৭ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে প্রবাসী ভোটাররা আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন বিদ্যমান পোস্টাল ভোট ব্যবস্থাকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে 'Postal Vote BD' নামে একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত ভোটাররা অনলাইনে আবেদন করে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন। আবেদনকারী ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই শেষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে তাদের বিদেশের ঠিকানায় পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হবে। প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হলে ভোটাররা অ্যাপের মাধ্যমে নিজ নিজ নির্বাচনি এলাকার প্রার্থী তালিকা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং নির্ধারিত নিয়মে ভোট প্রদান করবেন। ভোট প্রদান শেষে ব্যালট ফেরত পাঠানোর অগ্রগতিও অ্যাপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা সংযুক্ত সিডিউল অনুযায়ী 'Postal Vote BD' অ্যাপের মাধ্যমে পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধন করতে পারছেন। নিবন্ধন চলবে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ভোটারকে যে দেশ থেকে ভোট দিতে ইচ্ছুক, কেবলমাত্র সেই দেশের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে এবং Google Play Store অথবা App Store থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীদের ২৫শে ডিসেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিতদের ১৮-২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫ এবং আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারদের ২১-২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে Postal Vote BD অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে।

অ্যাপে প্রবেশ করে ব্যবহারকারী বাংলা বা ইংরেজি যে-কোনো একটি ভাষা নির্বাচন করে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও কাগজপত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়ায় OTP, লাইভনেস ও জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই সম্পন্ন করে নিবন্ধন নিশ্চিত করা হবে। ভোটারদের ক্ষেত্রে বিদেশে ব্যালট সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়া ভোটারদের কাছে পর্যায়ক্রমে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটাররা তাদের প্রদত্ত ঠিকানায় একটি পোস্টাল প্যাকেজ পাবেন; যেখানে ব্যালট পেপার, ভোট প্রদানের নির্দেশাবলি, ঘোষণাপত্র, ব্যালট রাখার ছোটো খাম এবং রিটার্নিং অফিসারের ঠিকানা সংবলিত ফেরত খাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। খাম

পাওয়ার পর ভোটাররা অ্যাপে লগইন করে খামের ওপর থাকা QR কোড স্ক্যান করলে সংশ্লিষ্ট ব্যালটটি সিস্টেমে শনাক্ত হবে।

ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটাররা প্রাপ্ত ব্যালট পেপারে মুদ্রিত প্রতীকের পাশে টিক বা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ভোট প্রদান করবেন। ভোট দেওয়ার আগে ঘোষণাপত্রে ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বর, ভোটারের নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর উল্লেখ করে স্বাক্ষর করতে হবে। নিরক্ষর বা অক্ষম ভোটারের ক্ষেত্রে অন্য একজন বৈধ ভোটারের সহায়তায় ঘোষণাপত্র পূরণ ও সত্যায়নের বিধান রাখা হয়েছে, যা ছাড়া ব্যালট বৈধ বলে গণ্য হবে না।

ভোট চিহ্নিত করার পর শুধু ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত ছোটো খামে ভরে সেটি বন্ধ করতে হবে এবং পরে স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রসহ রিটার্নিং অফিসারের ঠিকানা মুদ্রিত ফেরত খামে প্রবেশ করিয়ে ডাকযোগে পাঠাতে হবে। এই ডাক প্রেরণের জন্য ভোটারকে কোনো মাশুল প্রদান করতে হবে না, কারণ সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করবে। পোস্টাল ভোট গণনা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসারের কাছে পৌঁছানো ব্যালটই কেবল গণনার আওতায় আসবে।

এদিকে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষ্যে দেশে অবস্থানরত কিন্তু নিজ ভোটার এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারদের জন্য ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোট (ICPV) ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। এই শ্রেণির ভোটারদের আগামী ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে 'Postal Vote BD' অ্যাপে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে iBAS++ সিস্টেম ব্যবহার করে পরিচয় যাচাই করা হবে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত নিবন্ধন কার্যক্রম চালু থাকবে, কারণ এই সময়ের বাইরে iBAS++ সিস্টেম বন্ধ থাকে। নির্বাচন কমিশন সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরকে তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পোস্টাল ভোটে নিবন্ধনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে এবং বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের নির্দেশনা দিয়েছে।

যে-কোনো নির্বাচনি ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এর স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার ওপর। আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতিতে ভোটার পরিচয় যাচাইয়ে বায়োমেট্রিক বা ডিজিটাল অথেনটিকেশন ব্যবহারের সুযোগ থাকায় প্রকৃত ভোটার ছাড়া অন্য কারও পক্ষে ব্যালট গ্রহণ বা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। প্রতিটি পোস্টাল ব্যালটে ইউনিক কিউআর কোড সংযুক্ত থাকায় ব্যালটের প্রিন্টিং থেকে শুরু করে ডাকযোগে পাঠানো, গ্রহণ এবং গণনার প্রতিটি ধাপ ট্র্যাক করা যায়। এর ফলে ব্যালট হারানো, বদলানো বা অননুমোদিতভাবে ব্যবহার করার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে এনক্রিপশন ও আধুনিক ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করায় ভোটারের ব্যক্তিগত তথ্য ও ভোটের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি ভোটার পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে বিপুল অংশ প্রবাসী বাংলাদেশি, যাদের মধ্যে সৌদি আরব, কাতার, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ভোটারদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবী ও নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারাও এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হচ্ছেন। এই সংখ্যা কেবল প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতাই তুলে ধরে না, বরং প্রবাসী ও কর্মজীবী নাগরিকদের দীর্ঘদিনের ভোটাধিকার প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

এ পর্যন্ত 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে ২১শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬১৭ জন ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ৫ লাখ ৩৯ হাজার ১১১ জন পুরুষ এবং ৩৬ হাজার ৫০৪ জন নারী ভোটার রয়েছেন, যা প্রবাসী ও কর্মজীবী ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। দেশভিত্তিক নিবন্ধনের হিসাবে সৌদি আরব থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭১৭ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর পরের অবস্থানে রয়েছে কাতার, মালয়েশিয়া, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়াসহ একাধিক দেশ।

ব্যয় ও বাস্তবায়নের দিক থেকেও পোস্টাল ভোটিং একটি তুলনামূলক সাশ্রয়ী ব্যবস্থা হিসেবে সামনে এসেছে। ইনকান্ট্রি পোস্টাল ভোটিংয়ে একজন ভোটারের জন্য খরচ পড়বে মাত্র ২২ টাকা, অন্যদিকে প্রবাসী ভোটারদের ক্ষেত্রে এই খরচ গড়ে প্রায় ৭০০ টাকা বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন শুরুতে পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধনের প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল ১০ লাখ ভোটার। বর্তমান নিবন্ধনের ধারা অব্যাহত থাকলে এই সংখ্যা ৫ থেকে ৬ লাখে পৌঁছাতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

প্রযুক্তিনির্ভর যাচাই, স্বচ্ছ ট্র্যাকিং ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মাধ্যমে পরিচালিত এই পদ্ধতি প্রবাসী ও দেশে অবস্থানরত কিন্তু নিজ ভোটার এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত বেসামরিক ভোটারদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছে। নিবন্ধনের পরিসংখ্যান ও অংশগ্রহণের প্রবণতা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ সহজ হলে নাগরিকরা তা গ্রহণ করতে আগ্রহী।

মো. খালিদ হাসান: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, [সৌজন্যে: পিআইডি ফিচার]

বেগম খালেদা জিয়াঃ মৃত্যুঞ্জয়ী এক মহীয়সী

হাসান হাফিজ

তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। আপোশহীন এক মহীয়সী নারী। গৃহবধূ থেকে রাষ্ট্রনেতায় রূপান্তর– মামুলি কোনো ঘটনা নয়। তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়। তাঁর কৃতি ও কীর্তি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত বিস্তৃত হয়েছে বহির্বিশ্বেও। তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন, থাকবেন। তাঁর নীতি-আদর্শ, কর্মজীবন, পরমতসহিষ্ণুতা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা আমাদের পাথেয় ও প্রেরণা হয়ে চিরজাগরূক হয়ে আছে। তাঁর প্রস্থানে আজ পুরো দেশে শোকের আবহ; শোক পরিণত হোক শক্তিতে– এই হলো নতুন প্রজন্মের প্রত্যয় ও অঙ্গীকার। অপরাজেয় বেগম খালেদা জিয়া (১৯৪৫-২০২৫) যে উজ্জ্বল মহৎ এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয়, বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

দেশ, মানুষ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সম্পর্কে তাঁর অনেক কথা, অনেক উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণই সর্বদা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, '...এই বাংলাদেশের সর্বত্র আমি ঘুরেছি। খুব কাছে থেকে দেখেছি এই দেশকে। দেখেছি মানুষের সমস্যা। দেখেছি ভাঙা সেতু, ভাঙা রাস্তা। মানুষের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তাদের স্বপ্নের কথা। তারা শান্তি চায়, মঙ্গল চায়। চায় সাধারণভাবেই বেঁচে থাকতে। মা, জননী, জন্মভূমি আমার বাংলাদেশ। এই দেশ, এই মাটি, এই মানুষ আমার খুব প্রিয়। এই দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই। এই দেশই আমার ঠিকানা। যে দিন দেখব এই দেশের উন্নতি হয়েছে, মানুষজন সুখী হয়েছে সে-দিনই ওদের স্বপ্নের অংশীদার হতে পারব আমি। আমার স্বপ্ন ওই সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়...'।

মৃত্যুঞ্জয়ী এক মহীয়সী

নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে খালেদা জিয়া চলে গেছেন অনন্তলোকে। গণতন্ত্র, পরমতসহিষ্ণুতা ও দেশপ্রেমের তুলনারহিত এক প্রতীক তিনি। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে-মননে, গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায়, চর্চায়, সংকটে-স্বপ্নে তিনি অবধারিতভাবে যুক্ত থাকবেন। তাঁর ত্যাগ, দৃঢ়তা, দূরদর্শী প্রজ্ঞা, আপন মৃত্তিকা ও মানুষের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ আমাদের সবসময় শক্তি ও সাহস জোগাবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, তাঁর মতো অবিচল আপোশহীন প্রত্যয়ী একজন দেশনেত্রীকে আমরা পেয়েছি। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ, দেশাত্মবোধ স্বপ্নে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনিঃশেষ প্রেরণা ও পাথেয় হয়ে থাকবে।

সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে যত চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়েছে, তা মোটেও স্বস্তিদায়ক ছিল না। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক শাহাদত বরণের পর গৃহকোণ ছেড়ে তাঁকে জটিল-কুটিল অস্থির রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। শক্ত হাতে হাল ধরতে হয় শহিদ জিয়া প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপির। শেখ হাসিনার দুঃশাসনে তাঁর দল শুধু নয়; নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনও এক দুর্বিষহ অবস্থায় নিপতিত হয়। কিন্তু তিনি অপরিসীম ধৈর্য, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সহিষ্ণুতা দিয়ে সেসব অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। শুধু বাংলাদেশের

শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া

প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না তিনি, বেগম রোকেয়ার মতো বহু ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন। দেশ ও জনগণের অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষাকে তিনি বাস্তবরূপ দান করতে সক্ষম হন।

পূর্ণ সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির সংযোজন, নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, স্বৈরাচারের প্রলোভন ও ফাঁদ উপেক্ষা করে জনপ্রত্যাশার রূপায়ণে অটুট আপোশহীনতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি।

পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার অপশাসনকালে তাঁকে নজিরবিহীন সমস্যাসংকুল অনভিপ্রেত, অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। শেখ হাসিনার পৈশাচিক প্রতিহিংসার নির্মম শিকার হয়েছেন তিনি। মিথ্যা মামলায় নিগৃহীত-নিপীড়িত পর্যুদস্ত করা হয়েছে তাঁকে। মধ্যযুগীয় বর্বরতায় তাঁকে অফিসে দীর্ঘসময় অবরোধ করে রাখা হয়। স্বামী, স্বাধীনতার ঘোষক, সাবেক সেনাপ্রধান শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাঁকে। কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকোকে অকালে হারাতে হয়েছে। জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান এক-এগারোর নীলনকশার ষড়যন্ত্রী সরকার কর্তৃক এমন নৃশংসতার শিকার হয়েছিলেন যে, একপর্যায়ে তাঁর প্রাণসংশয়ও হয়েছিল। মহীয়সী নারী বেগম জিয়া সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো হাজারো অপমান, নির্যাতন সহ্য করেছেন। যে দানবীয় হিংস্রতার শিকার তিনি হয়েছেন; তার হোতাদের কী পরিণতি হয়েছে, তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছেন। একেই বোধহয় বলা হয় প্রকৃতির প্রতিশোধ।

বেগম খালেদা জিয়ার এক জবানবন্দি থেকে জানা যায়, আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম শহিদ জিয়াউর রহমানের আদর্শের পতাকা হাতে নিয়ে। আমার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে। আমি সব সময় চেয়েছি, বাংলাদেশ যেন গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয়। মানুষের যেন অধিকার থাকে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে। আমি চেয়েছি, আমাদের অর্থনীতি যেন শক্তিশালী হয়। বিশ্বসভায় বাংলাদেশ মর্যাদার আসন পায়। সেই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্যই আমার রাজনীতি। আমি রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশ ও জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে একাকার করে ফেলেছি।...

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাই আমার আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। আমার জীবন পুরোপুরি জড়িয়ে গেছে এ দেশের মানুষের স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের সঙ্গে। তাদের সুখ-দুঃখ ও উত্থান-পতনের সঙ্গে; দেশের মানুষের জীবনের চড়াই-উতরাই ও সমস্যা-সংকটের সঙ্গে। তাদের বিজয়, বিপর্যয় এবং সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে। দেশ-জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গেই একাকার হয়ে গেছে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'।

খালেদা জিয়া ১৮ কোটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থায়ী ঠাঁই পেয়েছেন। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের গাথায় তাঁর নাম, অবদান ও ভূমিকা খোদিত হয়ে রইল উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে। রাজপথে লড়াকু আন্দোলন, সংগ্রাম, দেশ পরিচালনা, সহিষ্ণুতার জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা যুগ যুগ ধরে উল্লিখিত হবে। ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে আমরা তার

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করছেন বেগম খালেদা জিয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান

প্রমাণ পাই। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রার ৩রা জানুয়ারি ১৯৯২ বিশেষ সংখ্যার একটি বিশেষ প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ওই বিশেষ প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে:

'১৯৯১-এর রাজনীতি ছিল গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন রূপায়ণের বছর। ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানকালে রুদ্ধ পথের মানুষের প্রত্যাশার অভিব্যক্তি ছিল তিন জোটের রূপরেখা, যার মূল লক্ষ্যই ছিল গণমুখী ও জবাবদিহিমূলক সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। এরশাদের পতনের পর তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব নির্ধারিত হয় একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং বিজয়ের স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে আখ্যায়িত খালেদা জিয়ার ব্যক্তিত্বে নতুন মাত্রা সংযোজনের পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি হয় ঠিক সেখান থেকেই।...

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে শুরু করতে হয় বিরোধী দলগুলোর প্রথাসিদ্ধ বৈরিতার মধ্য দিয়ে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে বিএনপির মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকারের বিরোধিতা করে জাতীয় পার্টির পাশাপাশি আওয়ামী লীগও। দল দুটির কট্টর বিরোধিতার তাজা স্মৃতি মনে রেখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে হিসেব করতে হয়েছে ভবিষ্যৎ বৈরিতারও।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে শুরু করতে হয় আরও কিছু বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে। এরশাদ আমলের দুর্নীতি বিস্তৃত প্রশাসনিক কাঠামো এবং গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার ঝড়-ঝাপটার মুখে পড়তে হয় তাঁকে।

ব্যাপকতর অর্থে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণ-অভ্যুত্থানের উপজাত সমস্ত বিশৃঙ্খলার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকেই নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। রাস্তায় নেমে আসা, আগুনে-স্লোগান দেওয়া, জীবনপণ আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে ফেরানো, শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবী সকলকে কর্মস্থলে ফেরানো, অসহিষ্ণু অস্থির সমাজের বিভিন্ন অংশের দাবিমালা সামলানোর সমস্ত গুরুদায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পালন করতে হয়।'

মহীয়সীর মৃত্যু হয় না। তিনি আমাদের মাঝে আছেন। থাকবেন। জাতীয় সংকটে, সংগ্রামে, স্বপ্নজয়ের প্রত্যয়ে তাঁর কাজ ও আদর্শ অবিনশ্বর আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাবে আমাদের। শোক পরিণত হোক শক্তিতে। বেদনাহত উপলব্ধি হয়ে উঠুক প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যের বীজমন্ত্র।

হাসান হাফিজ: সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

গৃহবধূ থেকে আপোশহীন নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ও অবিস্মরণীয় নাম বেগম খালেদা জিয়া। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী তিনি। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নির্বাচিত নারী সরকারপ্রধানও বেগম খালেদা জিয়া। একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের প্রশ্নে তিনি 'আপোশহীন' নেত্রীর উপাধি পান।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রাম, আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বেগম খালেদা জিয়া ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন। খালেদা জিয়া শুধু একজন ব্যক্তি নন, নিজ কর্মগুণে নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। হয়ে উঠেছেন এক জীবন্ত ইতিহাস।

রাজনৈতিক জীবন শুরু

১৯৮১ সালের ৩০শে মে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে যখন হত্যা করা হয়, বেগম খালেদা জিয়া তখন নিতান্তই একজন গৃহবধূ।... বিএনপির নেতাদের পরামর্শ ও অনুরোধে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৮২ সালে বিএনপিতে সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ১৯৮৩ সালে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৪ সালের আগস্টে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন।

আন্দোলন ও নেতৃত্ব

দলে দায়িত্ব নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে গঠিত সাতদলীয় জোটের নেতৃত্ব দেন তিনি।... বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের দূরদর্শিতায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ৩২১টির মধ্যে ২৭০টি ছাত্র সংসদে বিজয় লাভ করে, যা গণ-আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে। ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে এরশাদের পতনে তাঁর নেতৃত্ব ছিল অবিস্মরণীয়। দীর্ঘ আন্দোলনে গণতন্ত্র প্রশ্নে লড়াই সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়া 'আপোশহীন' নেত্রীর খ্যাতি লাভ করেন। একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর জোরালো অবস্থান ছিল অতুলনীয়।

বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম নির্বাচন

১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবকটিতে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন বেগম খালেদা জিয়া। সে নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী

১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নির্বাচিত নারী সরকারপ্রধান হন বেগম খালেদা জিয়া। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব খালেদা জিয়া শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, বরং মুসলিম বিশ্বেও একজন পথিকৃৎ নারী সরকারপ্রধান হিসেবে বিরল মর্যাদা অর্জন করেন।

১৯৯১ সালের ১৯শে মার্চ বেগম খালেদা জিয়া পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর সরকার দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

প্রথম মেয়াদে (১৯৯১-১৯৯৫) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রে পা রাখে। তাঁর প্রথম মেয়াদেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার, নারীর কর্মসংস্থানে অগ্রগতি এবং অর্থনীতির ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তৈরি পোশাক খাতে পাঁচ বছরে কর্মসংস্থান ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় দুই লাখ নারী নতুনভাবে যুক্ত হন।

জনসভায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার

তিনি জাতিসংঘে গঙ্গার পানিবণ্টন ইস্যু উত্থাপন করেন, যার ফলে বাংলাদেশের ন্যায্য অংশ পাওয়া নিশ্চিত করার উদ্যোগ জোরদার হয়। ১৯৯২ সালে হোয়াইট হাউস সফরে তিনি রোহিঙ্গা সংকট তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে।

দ্বিতীয়বার নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। স্বল্প সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন তিনি। কারণ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ নানা ইস্যুকে সামনে এনে টানা ১৭৩ দিন হরতাল করে। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদে প্রয়োজনীয় সদস্য না থাকায় বেগম খালেদা জিয়া ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করেন। ষষ্ঠ সংসদে বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিল পাস হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নতুন নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা রেখে যান বেগম খালেদা জিয়া।

তৃতীয়বার নির্বাচনে অংশগ্রহণ

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাস হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও এককভাবে ১১৬টি আসন পেয়ে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। সে নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঁচটি আসন থেকে বিজয়ী হন।

চারদলীয় জোটগঠন

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অপশাসন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জোটভিত্তিক আন্দোলন ও কর্মসূচি পালন করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এই জোট।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সে নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বে চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন বেগম খালেদা জিয়া। সে নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫টি আসনে নির্বাচন করে নির্বাচিত হন তিনি।

২০০১-২০০৫ মেয়াদে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নারী শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক সংস্কারে তাঁর সরকার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। ২০০৫ সালে নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফোর্বস ম্যাগাজিনে বিশ্বের ক্ষমতাশালী নারীদের তালিকায় তিনি ২৯তম স্থান পান। তাঁর সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা, উপবৃত্তি ও খাদ্য সহায়তা, সরকারি চাকরিতে বয়সসীমা বৃদ্ধিসহ নানা যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পরীক্ষায় নকল দমনেও তাঁর সরকারের সফলতা প্রশংসিত হয়।

অশ্রুসিক্ত বিদায়: নজিরবিহীন জনসমুদ্রে বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা সম্পন্ন

লাখো মানুষের অশ্রুসিক্ত ভালোবাসা আর গভীর শ্রদ্ধায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ বুধবার বেলা ৩টায় রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম এই জানাজায় অংশ নিতে আসা মানুষের ভিড় সংসদ ভবন এলাকা ছাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এক মহাসমুদ্রে রূপ নেয়।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মুফতি আবদুল মালেক জানাজার নামাজ পড়ান। দুপুর ২টায় জানাজা শুরুর সময় নির্ধারিত থাকলেও ভোর থেকেই মানিক মিয়া এভিনিউ ও এর আশপাশের এলাকায় মানুষের ঢল নামে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অগণিত মানুষ প্রিয় নেত্রীকে শেষবারের মতো এক নজর দেখতে রাজধানীজুড়ে জনস্রোত তৈরি করে।

জানাজায় অংশ নেওয়া সাধারণ মানুষ ও নেতা-কর্মীরা জানান, বেগম খালেদা জিয়া আমৃত্যু জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আজ কৃতজ্ঞ জাতি তার শেষ বিদায়বেলায় সেই ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। দীর্ঘ ৪৫ বছরের রাজনৈতিক লড়াইয়ে তিনি যে জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আজকের এই মহাসমুদ্র তারই প্রমাণ।

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর জানাজায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসসহ দেশি-বিদেশি শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিদেশি অতিথিদের মধ্যে পাকিস্তানের স্পিকার সরদার আইয়াজ সাদিক, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা অংশ নেন।

দেশের নেতাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জানাজায় শরিক হন। জানাজায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজার আগে তাঁর জীবন ও কর্ম সবার উদ্দেশে তুলে ধরেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। এছাড়াও পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বক্তব্য রাখেন।

[তথ্যসূত্র: বাসস, ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫]

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে পরিযায়ী পাখির ঝাঁক

আমাদের পরিযায়ী পাখি

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

এক সময় শীতের আমেজ শুরু হতেই অতিথি পাখির কলকাকলি শুনতে পেতাম। শীতের সন্ধ্যায় গরম গরম ভাপা পিঠা খেতে যেমন মজা লাগত তেমনি মন ভরাতো অতিথি পাখির কলতান। যদিও ইদানিং শহরের কোলাহলে সন্ধ্যায় উড়ে যাওয়া পাখির কলতান শুনতে পাই না। কিন্তু শহর থেকে খানিকটা দূরে, কিছুটা গ্রামের দিকে যেখানে খালবিল রয়েছে সেখানে গেলে এখনও ওদের কলকাকলি শোনা যায়। এই যে অতিথি পাখির কথা বললাম, ওরা কি আসলেই আমাদের অতিথি? না, মোটেও না। ওরা আসলে পরিযায়ী পাখি। ইংরেজিতে যাদের বলে Migratory birds. যা হোক পরিযায়ী পাখি কি সেটা বলার আগে পাখি কি তা জেনে নেই।

সাধারণভাবে পাখি হলো পৃথিবীজুড়ে নানা ধরনের পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন আকার-আকৃতি, ওজন ও বর্ণের উষ্ণ-রক্তবিশিষ্ট মেরুদণ্ড প্রাণী। যাদের দেহ পালকে আচ্ছাদিত, চোয়ালের উপর রয়েছে দাঁতবিহীন শক্ত চঞ্চু বা ঠোঁট, হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, স্ত্রীরা শক্ত খোসাযুক্ত ডিম পাড়ে, দেহের বিপাকীয় হার বেশি, হাড় ফাঁপা ও কঙ্কাল হালকা এবং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যারা সচরাচর উড়তে সক্ষম।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ হাজার প্রজাতি (Species) ও ২২ হাজার উপপ্রজাতির (Subspecies) পাখির বাস। অনুমান করা হয়, বিভিন্ন প্রজাতির পাখিগুলোর মোট সংখ্যা ২০ থেকে ৪০ হাজার কোটি। পুরো ভারতে যেখানে ১,৩৫৩ থেকে ১,৩৯৬ প্রজাতির পাখির বাস, সেখানে বাংলাদেশে কমবেশি ৭৩১ প্রজাতির পাখি রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, গত কয়েক শতকে দুশো প্রজাতির পাখি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে। আর বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১,২০০ প্রজাতির পাখি নানা কারণে হুমকির মুখে পড়েছে।

বাংলাদেশের মোট পাখির মধ্যে কমবেশি ৩৪০ প্রজাতির পাখি স্থায়ীভাবে বসবাস করে, অর্থাৎ এরা সারাবছর এদেশে থাকে, ডিম পাড়ে ও ছানা তোলে। এরাই হলো এদেশের আবাসিক পাখি (Resident Bird)। এছাড়াও প্রায় ৩৭০ প্রজাতির পাখি পরিযায়ী অর্থাৎ বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় এদেশে আসে, বসবাস করে ও সময়মতো মূল আবাসে ফিরে যায়। এসব পাখি এদেশের মানুষের কাছে আগে, এমনকি এখনও, 'অতিথি পাখি' নামেই পরিচিত। এদেরই এক বিশাল অংশ এদেশে আসে শীতকালে যারা শীতের পরিযায়ী পাখি (Winter Migrant) নামেও পরিচিত।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে কেন শীতপ্রধান দেশের এই পাখিগুলো আমাদের দেশে আসে? আসলে এসব পাখি এদেশে বা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়া সম্পন্ন দেশে আসে কারণ শীতে তাদের মূল দেশে আবাসস্থল বসবাস অনুপযোগী হয়ে যায়। তাই ওরা খাদ্যের অভাব ও প্রচণ্ড শীতের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বাংলাদেশসহ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে পরিযায়ন (Migration) করে। এটা এদের জীবনচক্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে বেড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই, আছে জীবন বাঁচানোর তাগিদ। তাই এসব দেশকে এদের দ্বিতীয় আবাস (Second Home) বা শীতকালীন আবাস বলা যায়। তবে একটি কথা মনে রাখা উচিত, এরা কিন্তু এসব দেশে বংশবিস্তার করে না। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন- কুড়া ঈগল (Pallas's Fish Eagle) শীতকালে এদেশে আসে বংশবৃদ্ধির জন্য।

যদিও পরিযায়ী পাখি বলতে মূলত শীতের পাখিগুলোকেই বোঝানো হয়, কিন্তু কিছু পাখি গ্রীষ্মকালেও পরিযায়ন করে, যেমন- বিভিন্ন প্রজাতির কোকিল (Cuckoo) ও হালতি বা সুমচা (Pitta) পাখি। বিভিন্ন প্রজাতির কোকিল এদেশে আসে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে, অন্য উপযুক্ত পাখির বাসায় ডিম পাড়ে, ছানা ফোটে এবং ছানাসহ সকলেই আবার আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে তাদের শীতকালীন আবাসে চলে যায়।

অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রজাতির হালতি পাখি ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চে এদেশে আসে, জুন থেকে জুলাইয়ে ডিম পাড়ে ও ছানা তোলে, ছানারা বড়ো হয় এবং ৭ থেকে ৮ মাস এদেশে থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরে মূল আবাসে চলে যায়। এদেশের অনেক পাখি বিশারদই এদেরকে গ্রীষ্মের প্রজনন পরিযায়ী (Summer Breeder) বলে থাকেন।

এছাড়াও বেশকিছু প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এদেশে অনিয়মিতভাবে আসে। হয়ত এক বছর এলো, এরপর আবার ৫ বা ১০ বছর পর এলো, অন্যদের মতো প্রতিবছর এলো না। এদেরকে তাই যাযাবর বা ভবঘুরে বা অনিয়মিত পরিযায়ী পাখি বলে। আর এদের সংখ্যাও নেহাত কম না, এদেশে আসা সকল পরিযায়ী পাখির প্রায় তিন ভাগের একভাগ এরা।

আবার আরেক ধরনের পরিযায়ী পাখি আছে যারা অন্য কোনো দেশে পরিযায়নের এক পর্যায়ে এদেশে স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে আসে, যেমন– বাদামি চটক (Asian Brown Flycatcher), বন খঞ্জন (Forest Wagtail) ইত্যাদি। এরা পন্থ-পরিযায়ী (Passage-migrant) পাখি নামে পরিচিত। মূলত হেমন্তে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরে অন্য কোনো দেশে পরিযায়নের জন্য যাওয়ার পথে অল্প সময়ের জন্য এদেশে যাত্রা বিরতি করে এবং বসন্তে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চে মূল দেশে ফিরে যাওয়ার সময়ও আরেকবার এদেশে যাত্রা বিরতি করে।

পরিযায়ন অর্থাৎ Migration শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Migrara' থেকে যার অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন।

পাখির পরিযায়ন হলো একটি নিয়মিত মৌসুমী স্থানান্তর যা সচরাচর তার প্রজনন এলাকা ও শীতের আবাসের মধ্যে হয়ে থাকে। মেরু গাংচিল (Arctic Tern) প্রজনন ক্ষেত্র উত্তর মেরু

সিলেটের কানাইঘাটের বড়ো হাওরের শুকনো বিলে অনিয়মিত পরিযায়ী পাখি পাতি সারস

থেকে শীতের আবাস দক্ষিণ মেরুতে সবচেয়ে লম্বা পথ পাড়ি দেয়। ডোরা-লেজ জৌরালি (Bar-tailed Godwit) এক উড়নে প্রায় ১১,০০০ কিলোমিটার উড়ন পথ পাড়ি দিয়ে আলাস্কা থেকে নিউজিল্যান্ডে পরিযায়ন করে।

এবার আসা যাক কোন ধরনের পাখিরা এদেশে পরিযায়ন করে?

১. সৈকত, নদী, মোহনা ও জলাভূমির পাখি (কমবেশি ৮২ প্রজাতি): মোট সংখ্যার হিসেবে পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে সৈকত, নদী, মোহনা ও জলাভূমির পাখির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। আর এদের আশ্রয়স্থল পূর্ব এশিয়া-অস্ট্রালেশিয়া পরিযায়ী পাখির উড়ালপথ অংশীদারিত্ব (East Asian–Australasian Flyway

Partnership- EAAFP) ঘোষিত ছয়টি উড়ালপথ আবাস্থল (Flyway Site), যেমন– হাকালুকি, টাঙ্গুয়ার ও হাইল হাওর (বাইক্কার বিলসহ), সোনাদিয়া দীপপুঞ্জ, নিঝুম দ্বীপ (দমার চরসহ) এবং গাঙ্গুইরার চর। এছাড়াও রাজশাহী শহরের পাশের পদ্মা নদী ও চরাঞ্চল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুরের চরইল বিল, যমুনার চর, মেঘনার মোহনা, কাপ্তাই লেক, সিলেটের কানাইঘাটের বড়ো হাওর, উপকূলীয় এলাকা, সুন্দরবন ইত্যাদি এলাকায় দেখা যায়। সৈকত ও জলচর পাখিগুলোর মধ্যে বেশকিছু মহাবিপন্ন (Critically Endangered) পাখি রয়েছে, যারা বিলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে পড়েছে। যেমন- চামচঠুঁটো চাপাখি (Spoonbill Sandpiper), সোনাজঙ্ঘা (Painted Stork), মানিকজোড় (Woollynecked Stork), খুন্তে বক (Eurasian Spoonbill), বড়ো ভূতিহাঁস (Baer's Pochard), তিলা সবুজ চাপাখি (Spotted Greenshank) ইত্যাদি।

২. বনজঙ্গল, বাগান, কুঞ্জবন ও ঝোপঝাড়ের পাখি (প্রায় ১৫৬ প্রজাতির পাখি): এদেশে পরিযায়ী পাখির মোট প্রজাতির হিসাবে বনজঙ্গল, বাগান, কুঞ্জবন ও ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেওয়া পাখিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। আর এদের আশ্রয়স্থল সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন মিশ্র চিরসবুজ বন, কেন্দ্রীয় (ঢাকা বিভাগ ও কুমিল্লা) ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় (রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ)

চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুরের চরইল বিলে অতি বিরল অনিয়মিত পরিযায়ী পাখি শ্বেত-কপাল রাজহাঁস

বিভিন্ন পত্রঝরা বা শালবন, সুন্দরবন ও উপকূলীয় বাদা বন, গ্রামীণ বন, ঝোপঝাড়, ঘাসবন ও বাঁশবনজুড়ে বিস্তৃত।

পরিযায়ী পাখিরা নানাভাবে আমাদের উপকার করে। এরা আমাদের জীববৈচিত্র্যের অংশ। পরিযায়ী পাখিরা যে শুধু প্রকৃতি ও পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাই নয়, বরং আমাদের অনেক উপকারও করে। যেমন–

ক) এরা কৃষির ক্ষতিকারক পোকমাকড় দমনে সাহায্য করে।

খ) ময়লা-আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে।

গ) এদের মল জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) এরা পরিবেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ সূচক হিসেবে কাজ করে।

তাছাড়া পাখি পর্যবেক্ষণ বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় বিনোদনমূলক বিষয়। দিনে দিনে 'পাখি দেখা' বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে পরিবেশ-পর্যটনের উন্নয়ন হচ্ছে যা একটি বিলিয়ন ডলার শিল্প হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যেই এটি জৈব-অর্থনীতির সম্ভাব্য উৎস হয়ে উঠেছে।

পরিযায়ী পাখিরা যে ভৌগোলিক পথে এক দেশ থেকে অন্য দেশ বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করে তাকে বলে পরিযায়নের উড়ন পথ বা Flyway বলে। পাখি বিশেষজ্ঞরা বিশ্বব্যাপী পাখির পরিযায়নের নয়টি পথ আবিষ্কার করেছেন। জাতিসংঘের UNEP (United Nation Environment Program), CMS (Convention on Migratory Species of Wild Fauna) এবং অন্যান্য সমধর্মী সংস্থার উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে প্রতিবছর ৯-১০ই মে ও ১০ই অক্টোবর বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আর বাংলাদেশ এ দিবসটি ২০১০ সাল থেকে পালন করছে। এশিয়ায় পাখির চারটি উড়ন পথের মধ্যে বাংলাদেশ CAF ও EAAFP-এর অন্তর্ভুক্ত। EAAFP উড়নপথ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উড়নপথ। এই পথের আওতায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২২টি দেশে পাখিরা পরিভ্রমণ করে। বাংলাদেশ ২০১১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর EAAFP-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিবছর বিশ্বের কমবেশি ২৫০ প্রজাতির প্রায় ৫ কোটি পরিযায়ী পাখি এই পথ ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিকভাবে এ পথে চলাচলকারী ৩২ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি মহাবিপন্ন ও ১৯ প্রজাতি বিপন্ন (Endangered) বলে চিহ্নিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৮টি মহাবিপন্ন, ৬টি বিপন্ন ও ৮টি সংকটাপন্ন (Vulnerable) প্রজাতি এ পথে এদেশে পরিযায়ন করে।

আশা করি পাঠক এখন থেকে এসব পাখিদের অতিথি না ভেবে আমাদের নিজস্ব পাখি হিসেবেই ভাববেন। আর এদেরকে এদেশের পরিবেশের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করবেন। একটি কথা মনে রাখবেন, এসব পরিযায়ী পাখি শিকার করে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেললে কোনো কোনো মহাবিপন্ন প্রজাতির পাখি শুধু আমাদের দেশ নয়, কথা গোটা বিশ্ব থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আর সেটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। কাজেই পরিযায়ী পাখি রক্ষায় আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান: পাখি ও বন্য প্রাণী প্রজনন ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যাপক, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের শীত আর কবিতা

কাজী আলিম-উজ-জামান

বাংলাদেশের শীত আসে নদীর কিনারে নরম কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে। ধানক্ষেতের সোনালি ডাঁটা শিশিরে ভিজে ঝকঝকে হয়ে ওঠে, আর গ্রামের পথে পায়ের নীচে শুকনো পাতা মর্মর করে। কুয়াশার ভেতর দিয়ে সূর্য উঁকি দেয় লাজুক মেয়ের মতো, আলো ছড়ায় কিন্তু ওম দিতে পারে না। মানুষ শীতের কামড়ে কাঁথা জড়িয়ে বসে আগুনের পাশে, চায়ের কাপে হৃদয় গরম উষ্ণ করে, আর মনে মনে পুরানো দিনের গল্প জাগে। এই শীত নিষ্ঠুর নয়, বরং একটা মায়াময় স্পর্শ— যেন প্রকৃতি নিজে এসে বলে, থামো একটু, শুনো আমার নিশ্বাস।

আর এই শীতেরই ছোঁয়ায় এদেশের কবিরা কলম তুলে নেন। কুয়াশার আড়ালে লুকানো গ্রামের আলো, শীতের সকালে পিঠে খাওয়ার ধোঁয়া, নদীর জলে ভাসা শেওলার ঘ্রাণ— সব মিশে যায় তাদের ছন্দে। জীবনানন্দের মতো কেউ দেখেন শীতের নদীতে অন্ধকারের প্রতিচ্ছবি, কেউ রবীন্দ্রনাথের মতো শোনেন শীতের বাতাসে অদেখা পাখির ডাক। কবিতা হয়ে ওঠে শীতের কাঁথা, যা গায়ে জড়ালে ঠান্ডা লাগে না, বরং হৃদয় গরম হয়ে ওঠে স্মৃতি আর ভালোবাসায়। বাংলাদেশের শীত আর তার কবিতা— দুটোই একই সুরে গায়, চুপিচুপি, গভীরভাবে।

বাংলাদেশের শীত

পৌষ, মাঘ দুই মাস শীতকাল। হেমন্তের আলতো ঠান্ডা যখন শরীরকে অভ্যস্ত করে তোলে, তখন শীত তার নিজস্ব ছন্দে প্রবেশ করে। গ্রামের ঘরে ঘরে ধানভানা, চাল কোটার শব্দে যোগ হয় একধরনের ঘরোয়া সুর। শীতের এই ঘ্রাণ, এই শব্দ, এই অনুভব— সব মিলিয়ে তৈরি করে অনন্য এক নিবিড়তা।

শীত এলে বাংলার সকাল হয়ে ওঠে অন্য রকম। ভোরের আলো যখন প্রথম স্পর্শ করে ঘাসের আগায় ঝুলে থাকা শিশিরবিন্দুতে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন নতুন করে শ্বাস নিচ্ছে। গ্রামের পথ ধরে হাঁটলে দেখা যায় নরম কুয়াশার চাদরে মোড়া গাছপালা। দূরে কোথাও ধানক্ষেতের ওপর উঠে আসা সূর্যের আলোয় ঝিলিক খেলে যায় মায়াবী দৃশ্য।

রাজধানী ঢাকায়ও যেন অন্য রকম এক অনুভূতি জাগে। মানুষের গায়ে উঠে যায় হালকা শাল, পশমি সোয়েটার আর গরম কাপড়। পত্রিকা টেলিভিশনে পেট্রোলিয়াম জেলি, বডি লোশন ও ময়েশ্চারাইজারের বিজ্ঞাপন জোরেশোরেই চলে। গুলিস্তান, পল্টন, মতিঝিলের ফুটপাতে দেদার বিক্রি হয় শীতের পোশাক।

মানুষের ভিড়, যানজটের চেনা শব্দ, ব্যস্ত দিনের দীর্ঘ কর্মসূচির মাঝেও শীতের হালকা, পরিমিত এক ঠান্ডা যেন শহরের বাতাসে মিশে থাকে।

শীতের আরেকটা গল্প লুকানো থাকে পরিযায়ী পাখিদের কোলাহলে। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা দূর থেকে তারা আসে হাজার হাজার মাইল উড়ে। বাংলাদেশের জলাশয়, হাওর-বাঁওড় তাদের নিরাপদ আশ্রয়। পানিতে নেমে পাখিদের ডুবসাঁতার, ডানা ঝাঁপটানো আর আকাশে তাদের দলবদ্ধ উড্ডয়ন– সব মিলিয়ে শীত হয়ে ওঠে রঙিন।

গ্রামে শীত মানেই পিঠা-পুলির মৌসুম। নতুন ধানের গুঁড়া, খড়কুটোর উনুন আর টগবগে গুড়ের মিষ্টি ঘ্রাণ মিলে বাংলার শীতকে করে তোলে আপন এক ঋতু। দাদি-নানিদের হাতের পুলি, ভাপা ও চিতই পিঠার ধোঁয়া যেন পরিবারকে আরও কাছে টেনে আনে। কেউ নিজেরা খায়, কেউ আবার স্নেহভরা প্যাকেটে ভরে পাঠিয়ে দেয় দূরের আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি। শীত এভাবেই মানুষকে একত্র করে, ধীর করে, উষ্ণ করে।

শহরেও এখন পিঠার উৎসব কম নয়। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত রাস্তার ধারে ধোঁয়া ওঠা স্টলের সামনে ভিড় করে নানা বয়সের মানুষ, শীতের উষ্ণ স্বাদ নিতে শহরবাসী ভুল করে না।

এ সময় গাছের বৃদ্ধি কমে আসে, শীতের শেষ দিকে বিবর্ণ পাতারা টুপ টুপ করে খসে পড়ে।

তবে বসন্তের আগে শীতেও কিছু ফুল নিজেদের রঙে জানান দেয়। শীতকালীন ফুলের তালিকায় সবার আগে আসে গাঁদা। ফুটতে থাকে ডালিয়া, সূর্যমুখী, কসমস, চন্দ্রমল্লিকা, জারবেরা, গ্লাডিওলাস, গাজানিয়া, লিলিয়াম আর ডায়ান্থাস। এই ফুল শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন দিনগুলোতেও রঙের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেয়।

শীতে মাঠে মাঠে নানারকম ফসলের বাহার মুগ্ধ করে আমাদের। এ সময় গ্রামের মাঠে, বাড়ির আঙিনায়, রাস্তার আশপাশে পালংশাক, সর্ষে, বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিভিন্ন জাতের লাউ, শিম, ধনেপাতার ব্যাপক চাষ হয়। এসব ফসল প্রতিদিন গাড়ি ভর্তি করে শহরে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

এ সময় পুকুর-ডোবা, নদ-নদী ও বিলের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় মাছ শিকারের ধুম লেগে যায়। নানা ধরনের ছোটো মাছ যেমন পুঁটি, মলা, ঢ্যালা, ট্যাংরা, কাঁচকি, চিংড়ি, তেলাপিয়া বেশুমার পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বোয়াল, শোল, আইড়, চিতল, রুই, পাঙাশ, রয়না, বাইনসহ নানা ধরনের বড়ো বড়ো ভিন্ন স্বাদের মাছের দেখা মেলে।

শীত যেমন আনন্দ আনে, তেমনি কিছু দায়ও মনে করিয়ে দেয়। পথশিশু, ছিন্নমূল মানুষ, ফুটপাতে রাত কাটানো শ্রমজীবী তাদের কাছে শীত এক প্রকার কষ্টেরই।

দেশের উত্তরের জেলাগুলোতে শীত যেন জেঁকে বসে। প্রায় প্রতিবছর এসব জায়গায় শিশু-বুড়োরা 'জাড়ে' বেশি কষ্ট পায়। শীতের সময় সর্দি, কাশি, জ্বর লেগেই থাকে। অ্যাজমা রোগীদের কষ্টের সীমা থাকে না। তাই শীত মানে শুধু নিজের উষ্ণতা নয়, অন্যের উষ্ণতার কথাও ভাবা।

শীতের কবিতা

বাংলা কবিতায় বর্ষা, শরৎ আর হেমন্তের উপস্থিতি বেশি। শীত সেই তুলনায় একটু কম। তবে অনেক লোকজ ছড়া, কবিতা আছে শীত ঘিরে। এর একটি 'পার হলে পাটনি শালা।' নদী বা ঘাট পার হয়ে গেলে খেয়ামাঝি বা পাটনিকে 'শালা' বলে গালি দেওয়া যায়, কারণ আর তার কাছে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই। এটা একটা লোকপ্রবাদের মতো– যার কাছাকাছি আরেকটা আছে: 'ঘাট পার হলে খেওয়ানি শালা'।

অথবা 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'। আশা করি, এটার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

বাংলা কবিতায় শীত এসেছে পশ্চিমা সাহিত্য থেকে, বিশেষ করে ইংরেজি কবিতা থেকে। কথাটা একেবারে ভুল হবে না। আমেরিকান-ইংরেজ কবি রবার্ট ফ্রস্ট তার 'স্টপিং বাই উডস অন এ স্নোয়ী ইভিনিং' কবিতাটি শীতের এক তুষারময় সন্ধ্যায় প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ানোর গল্প বলে, কিন্তু তার গভীরে লুকিয়ে আছে জীবনের দায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি এবং যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার কথা। ফরাসি লেখিকা সিডোনি-গাব্রিয়েল কোলেত জানুয়ারিকে লিখেছেন 'মান্থ অব এমটি পকেটস'। বলেছেন, এই মাসটাকে সহ্য করে নিতে। চারশো বছর আগে শেক্সপিয়ার লিখেছিলেন নাটক 'দ্য উইন্টারস টেল'।

শীতের বাংলা কবিতায় ফেরা যাক। প্রিয়তমার সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো উপায় না পেয়ে বর্ষার মেঘের কাছে লিখেছিলেন কালিদাস।

মঙ্গলকাব্যে নায়িকার বারো মাসের কষ্ট বর্ণনায় অনিবার্যভাবে শীত এসেছে। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়িকার বারমাস্যা বর্ণনা করছেন ঠিক এভাবে–

পউষের প্রবল শীত সুখী যেজন।
তুলি পাড়ি আছাড়ি শীতের নিবারণ॥
ফুল্লরার কত আছে কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥

অর্থাৎ পৌষের প্রচণ্ড শীতে যে সুখী থাকে সে-ই সত্যিকারের সুখী, কারণ সে শীতের কষ্ট সহ্য করতে পারে। তুলি (কাঁথা-কম্বল) পেড়ে আছড়িয়ে (গায়ে জড়িয়ে) শীত নিবারণ করা যায়। কিন্তু দরিদ্র ফুল্লরা (কল্কি ও ফুল্লরা দম্পতি, কাব্যের নায়ক-নায়িকা) কত কর্মের ফল ভোগ করে– মাঘ মাসে জঙ্গলে গিয়ে শাক তুলতেও পারে না (এত ঠান্ডা যে হাত-পা অসাড়)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল/ গানের হাওয়া শেষ না হতে/ মনে কথা ছড়িয়ে এলোমেলো/ ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।'

এ যেন একটা অসমাপ্ত গানের মাঝে শীতের উত্তুরে ঝড় এসে পড়া– গানের উষ্ণতা এখনো বাতাসে মিশে আছে, কিন্তু হঠাৎ শীতের হাওয়া ছুটে এসে সব এলোমেলো করে দিলো। মনের লুকানো কথাগুলো, স্মৃতির শুকনো পাতাগুলো উড়ে গেল স্রোতে– কোনো বাঁধ নেই, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই হাওয়া যেন স্মৃতির দরজা খুলে দেয়, কিন্তু সেই স্মৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিয়ে যায় দূরে, শুকনো পাতার মতো ভেসে যায়।

বাঙালির বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও কিছুটা শীতের দর্শন মেলে। 'শীতের সিন্ধু' কবিতায় তিনিও শীতকে জীবনের একটি পর্যায় হিসেবে দেখেছেন- 'ওগো মোর লীলা সাথী অতীত বর্ষার/ আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার।'

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের আধুনিক বাংলা কবিতায় বাংলার প্রকৃত গ্রাম্য শীতের ছবি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর অমর সৃষ্টি 'রাখাল ছেলে' কবিতায় শীতকালীন প্রভাতের এক অপরূপ, খেলাধুলায় ভরা দৃশ্য ফুটে উঠেছে– যেখানে প্রকৃতি নিজেই রাখাল ছেলেকে ডেকে খেলায় মাতে, 'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,/ সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোগে হাসে।' কিংবা 'সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই' কিংবা 'চলতে পথে মটরশুটি জড়িয়ে দুখান পা,/ বলছে ডেকে গায়ের রাখাল একটু খেলে যা!'

জীবনানন্দ দাশের কলমে শীত শুধু ঠান্ডা নয়– একটা অস্তিত্বের সংকট, মৃত্যুর ছায়া যা হৃদয়ে নিঃশব্দে এসে বসে। বাইরের শিশির ঝরা, হলুদ পাতার পতন, প্যাঁচার করুণ গান– সব মিলে একটা বিষণ্ন, কিন্তু অপরূপ ছবি। শীত এখানে জীবনের ক্ষণিকতার প্রতীক, যেন বলছে: সবকিছু ঝরে যায়, নীরবে, অন্ধকারে। শীতরাত কবিতায় যেমন তিনি বলেছেন, 'এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে; বাইরে হয়ত শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা, কিংবা প্যাঁচার গান; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।'

সুকান্ত ভট্টাচার্য শীতের সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেছেন, রাস্তার পাশের অসহায় শিশুটিকে সে যেন উত্তাপ দেয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা 'কোনো এক মাকে' কবিতায় শীতের প্রকৃতি 'কুমড়ো বড়ি'র বিচ্ছেদ অঙ্কিত হয়েছে।

শামসুর রাহমান শীত নিয়ে লিখেছেন একাধিক কবিতা। বিশেষ করে প্রথম দিকের কবিতাগুলোতে শীত এসেছে নানাভাবে। তাঁর 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'রূপালী স্নান' কবিতাতেই তিনি লিখেছেন, 'দুটুকরো রুটি/ না পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক গাঁ ঘুমেই বিবর্ণ হই।'

আল মাহমুদের কবিতায় বহু জায়গায় ছড়িয়ে– ছিটিয়ে রয়েছে শীত। যেমন 'কখনো ভোরের রোদে শিশিরের রেনু মেখে পায়/ সে পুরুষ হেঁটে যায় কুয়াশায় দেহ যায় ঢেকে।' এ যেন শীতের ভোরের এক নির্জন, মায়াময় ছবি। আল মাহমুদের কলমে শীত শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের একাকী যাত্রার প্রতীক- যেখানে ভোরের রোদের উষ্ণতা মিশে যায় কুয়াশার নীরবতায়।

শীত নিয়ে আরও কিছু কবি ও কবিতার লাইন উল্লেখ করতে পারি। বলা প্রয়োজন শীত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা সৃজন করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ, মহাদেব সাহা, আবিদ আজাদ, রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, মাহবুব হাসান, ইকবাল আজিজসহ অনেকেই।

কারও কবিতায় শীতের ঢেউ আবার নেমে আসে বুড়ো হাড়ে ঝনৎকার তুলে, কারও ভেতরে মাঘ নিশীথের আবছা কুয়াশা জমে থাকে, কারও ফুসফুসে শোনা যায় পাতাঝরার শব্দ। কোথাও মৃত মানুষের শীত সারারাত ভিজিয়ে দেয় শরীর, কোথাও আবার একটি পুরো শহরজুড়ে ছড়িয়ে থাকে ব্যক্তিগত শীতকাল- যেমন বসন্তে ঝরাপাতা পড়ে থাকে অলিগলিতে। শিশিরের নীচে পড়ে থাকে সাপের খোলস, নির্ঘুম গ্রাম স্বপ্ননিবিড় হয়ে ওঠে, শীতপাখির অবগাহনের পাশে রাঙাবধূ দাঁড়িয়ে থাকে খুব ভোরে।

এই শীত কখনো বকুলের মধুর হাসিতে নরম, কখনো হিমেল কুয়াশায় কনকনে, কখনো নাক্ষত্রিক বরফের কুচি কুড়োনো আকাশের মতো বিস্ময়কর। শেষ পর্যন্ত মনে হয়, অন্তত কবির বোধে- শীতই একমাত্র ঋতু; বাকি সবসময় যেন তারই দীর্ঘ প্রতিধ্বনি।

কাজী আলিম-উজ-জামান: সাংবাদিক, গবেষক, উপবার্তা সম্পাদক, প্রথম আলো, alimkzaman@gmail.com

মধুসূদনের কাব্য ও প্রজন্মের প্রেরণা

প্রফেসর ড. সবুজ শামীম আহ্সান

মহাবিশ্বে ঠিক কতটি নক্ষত্র আছে তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না তাতে সন্দেহ থাকতে পারে; এমনকি ঘন কালো মেঘে বৃষ্টি হবে কি না তাতেও সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ এবং বাংলা কবিতার ত্রাতা তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মহালগ্ন। পণ্ডিতেরা এ শতাব্দীকে নবজাগৃতি নামে অভিহিত করেছেন। মধুসূদন ছিলেন সে নব জাগরণের সার্থক প্রতিনিধি।[১] মধু শিকল ভাঙার কবি। তিনি পুরানো ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ভেঙে একটা নতুন মানবীয় সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে আলোর পথ দেখান মধুসূদনই। বাংলা সাহিত্যের কালবদল ও জাতবদলের পুরোধা তিনিই।[২] মধু একাই বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেন। নতুন প্রজন্মকে তিনি উদ্বুদ্ধও করেন নব চেতনায়।

বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের এক আকাশ পার্থক্য। মধ্যযুগের সাহিত্যে বৈচিত্র্যের বেশ অভাব। আধুনিক যুগে আসে বৈচিত্র্য। মধ্যযুগে মুদ্রণযন্ত্র না থাকায় সে সময়ের কাব্যগুলোকে সুরের মধ্যে রাখা হতো মনে রাখার জন্য।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ফলে সাহিত্যেও আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ জন্য কবিতাকেও সুরের বৃত্ত থেকে মুক্ত করা হয়। কবিতাকে তিনি মুক্ত করেছেন। কবির ভাবের সাথে কবিতার সমন্বয় করেছেন। কবিতার লাইনের শেষে তিনি দাঁড়ি বা অনুপ্রাসের ব্যবহার করে কবিতার ছন্দপতন করেননি বরং কবির ভাব পরিপূর্ণ হলেই মধুসূদন যতিচিহ্ন দিয়েছেন। মহাকবি অন্ত্যমিলহীন যতি–স্বাধীন প্রবাহমান ছন্দের সূচনা করেন। মূলত বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। সে কারণেই তাঁকে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক বলা হয়। *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে* কবির আধুনিক উচ্চারণ–

> পালিতে এ বিপুর জগৎ,
> সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
> অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন,
> হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম, জয় তথা।

মধুসূদন দত্তের সাহিত্য নিয়ে বাঙালির যতখানি আগ্রহ তারচেয়ে বেশি আগ্রহ তাঁর বৈচিত্র্যময় ও বর্ণাঢ্য জীবনের প্রতি। মহাকবি নিজ সমাজের অন্য সবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন, বলন, পোশাক, স্বভাব, মূল্যবোধ সবই ছিল আধুনিক ইউরোপীয়ানদের বা সাহেবদের মতো; বাঙালিদের মতো নয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল হিমালয়ের চেয়েও উচ্চ।[৪] কখনও ভাবতেন ইংরেজি সাহিত্যের বড়ো কবি হবেন, কখনও চিন্তা করতেন নামকরা ব্যারিস্টার হবেন। এ ধরনের

হাজারও ভাবনার বাস্তবায়নে তিনি মাত্র নয় বছর বয়স থেকেই নক্ষত্রের মতো সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে ফ্রান্সের ভার্সাই, তারপরে আবার কলকাতা, সেখান থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে আবার কলকাতা এভাবেই ঘুরেছেন সত্যের সন্ধানে, বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজকে আধুনিক উন্নত সমাজে পরিণত করবার মানসে।

মধুসূদন অধ্যবসায়ী কবি ছিলেন। মধু বলেন, 'আমার জীবন একটি বিদ্যালয়ের বালকের চেয়েও বেশি ব্যস্ত।[৫] তিনি ভোর ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত (মাঝে তিন ঘণ্টার বিরতি) পড়াশুনা করতেন। মধুসূদন অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে ছাত্রজীবনেই বারোটি ভাষা আয়ত্ত করেন। কবি বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন বলেই কাব্য, মহাকাব্য, নাটক ও প্রহসনে সার্থকভাবে নতুন ধারার প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন পরম বিস্ময়। জীবনের প্রথম ৩৪ বছর বাংলায় কিছুই লেখেননি বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাঁর জীবনে দ্বৈত সত্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে স্বদেশপ্রীতি, মানবতাবোধ ও জাতীয়তাবোধ। অন্য সত্তা জুড়ে ছিল বিদেশ প্রেম। দেশীয় সংস্কৃতির চেয়ে বিলেতি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।[৬]

মধুসূদন পূর্ব সাহিত্যে ঈশ্বর, দেব-দেবী, পুরাণ ও ধর্মের প্রভাব ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে দেবতা ও পুরাণ থেকে সরে এসে সমকালীন মানুষের জীবন নিয়ে নতুন ধরনের সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্তের লেখায় সমকালীন জীবনের খণ্ডচিত্র ফুঠে উঠেছিল। তিনি দেব-দেবীর পরিবর্তে ইংরেজি নববর্ষ

আনারস, আলু, তিল, গুড়, ক্ষীর নারকেল ষড়ঋতুর সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। এ সময় বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে সাহিত্যাকাশে উদিত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে সাহিত্যে প্রথমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন মধুসূদন দত্ত।[৭] মধুসূদন সাহস করে মধ্যযুগের শাসন থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করেন। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মৌলিক ও মানবাধিকার, এমনকি নারীর অধিকার নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তাছাড়া মধুসূদনের পোশাক চাল-চলন ছিল অত্যাধুনিক। যার জন্য উত্তরাধুনিক প্রজন্মের মনে মধুর স্থান সবার ওপরে। একবিংশ শতাব্দীর অনেকেই এখনও তাঁকে অনুসরণ করেন।

মধুসূদন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করবেন প্রথম জীবনে একথা স্বপ্নেও ভাবেননি। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় আর মধুসূদন দত্ত উক্ত কলেজে ১৮৩৭ সালে ভর্তি হন। হিন্দু কলেজে পড়াকালীন তিনি কবি রিচার্ডসনের কাছে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। শেক্সপিয়র, হোমার, মিল্টন, বায়রন ও টমাস ম্যুরের লেখা পড়ে মধু পাগল হয়ে যেতেন।[৮] তাছাড়া সে সময়ের বাংলা সাহিত্যের যে দুরবস্থা ছিল তাতে মধুসূদনের তৃপ্ত হওয়ার কথাও নয়। আর তখন বাংলা গদ্য সাহিত্যের তেমন উন্নতিও ঘটেনি। তাই ইংরেজি শিক্ষিত মধু ইংরেজি কবিতা লেখা শুরু করলেন। কলকাতা, মাদ্রাজ ও ইউরোপে বসেই মধু মোট ৬২টি ইংরেজি কবিতা রচনা করলেন। এর মধ্যে ৬০টি কবিতাই ছিল মৌলিক কবিতা। ইতোমধ্যে যে সব ভারতীয় কবি ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন মধুসূদনের সঙ্গে কারো তুলনাই চলে না। এক কথায় তাঁর ইংরেজি কবিতাগুলো ছিল অসাধারণ। কিন্তু The Captive Ladie এবং Visions of the past-এর কবিতাগুলো পাঠকের যথার্থ মূল্যায়ন পায়নি। তাছাড়া তৎকালীন ইংরেজ কবিদের অসহযোগিতা ও অহংবোধের কারণে মধুসূদন ইংলিশ কবি হিসেবে খ্যাতি পাননি। আবার তিনি ইংরেজি সাহিত্যের কবি হিসেবে মূল্যায়িত হলে আমরা *মেঘনাদবধের* মতো মহাকাব্যও যেমন পেতাম না; তেমনি বাংলাদেশের আধুনিক প্রজন্মেরও পয়ারের বৃত্ত ভাঙতে আরও অনেক সময় লাগত।

বাঙালি জাতির বয়স প্রায় ৩ হাজার বছর হলেও বাংলা সাহিত্যে যা কিছু নতুন, অভিনব, অত্যাধুনিক তার প্রায় সবকিছুই মধুসূদনের সৃষ্টি। শুধু বাংলা নয় গোটা ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্য ধারার প্রবর্তক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা এ সাহিত্যপুরুষের বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে মোট ১৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মহাকবির অসমাপ্ত রচনার সংখ্যা ৮টি। *সুভদ্রা*, *রিজিয়া*, *সিংহল বিজয়*, *মৎস্যাগন্ধা*, *সুভদ্রাহরণ*, *দুর্যোধনের মৃত্যু*, *হেকটর বধ* ও *বিষ না ধনুর্গুণের* রচনা তিনি শেষ করতে পারেননি।[৯] মধুসূদন দত্ত ১১০টি সনেট রচনা করেছিলেন। তিনিই বাংলা কাব্যে চতুর্দশপদীর প্রবর্তক। বঙ্গভাষা মধুসূদনের একটি বিশেষ চতুর্দশপদী। তবে এ ক্ষেত্রে কবি পেত্রাক ও শেক্সপিয়রের রীতির সাথে মিল রেখে নিজস্ব রীতির প্রবর্তন করেন বলে পণ্ডিতেরা মত পোষণ করেন। তবে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বাঙালির মনে একটা আলাদা স্থান করে নিয়েছে। কারণ এ কবিতা ১৪টি লাইন, ১৪টি অক্ষর এবং ১৪টি মাত্রায় পয়ার ছন্দে রচিত। সনেট কবিতা দুভাগে বিভক্ত প্রথম ৮ লাইনকে বলা হয় অষ্টক এবং এ প্রথম ৮ লাইনে সমস্যা ও ভাব প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় ৬ লাইনকে ষটক বলা হয় এবং এ শেষের ৬ লাইনে সমাধান করা হয়। যেমন– বঙ্গভূমির প্রতি, বঙ্গভাষা, বীরাঙ্গনা, কপোতাক্ষ নদ, বউ কথা কও প্রভৃতি। মহাকবির এ সনেটগুলোর মধ্যে দেশপ্রেমের একটি চিত্র ফুটে ওঠে বঙ্গভাষা কবিতায় তা লক্ষণীয়–

> হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
> তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
> পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য মধুদূনের এক বিদ্রোহের নাম। কারণ কবি এ কাব্যগ্রন্থে প্রচলিত পয়ারের পরিবর্তে নতুন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। এটি কবির এক অনন্যসুন্দর সৃষ্টি। *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্য পৌরাণিক কাহিনি সুন্দ-উপসুন্দের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।[১০] মাইকেল একপ্রকার জিদের বশে কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। একদা আড্ডায় বসে কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু যতীন্দ্রমোহনকে মধুসূদন বললেন, যতদিন না অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা নাটক বা কবিতা লেখা না হবে ততদিন পর্যন্ত বাংলায় ভালো নাটক বা কবিতা হবে না। বন্ধু যতীন্দ্রনাথ বললেন, সব ভাষাতে সবকিছু হয় না।[১১] তিনি আরো বললেন ঈশ্বরগুপ্তও পারেননি। মধু রেগে বললেন তোমাদের বুড়ো ঈশ্বর পারেননি বলে আর কেউ পারবে না? আমি তোমাদের ভুল ভেঙে দেব। মাত্র তিন–চার দিনের মাথায় মধুসূদন তাঁর *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্যের প্রথম সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করে পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহনকে পাঠিয়ে দিলেন। বন্ধু যতীন্দ্রমোহন *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্য অবাক হয়ে পড়তে লাগলেন।

> ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে–
> অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন;
> সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
> যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
> নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশশূলী–
> যোগীকুলধ্যেয় যোগী।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একাধারে ধনী, বিদ্বান ও সংগীতজ্ঞ তিনি দেখলেন: মধুসূদন এ কাব্যে একেবারে নতুন এক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এর গতিবিধি, চাল-চলন এবং স্পন্দনও ভিন্নতর। লাইনের শেষে মিল নেই সেজন্য নয়; সংস্কৃতেও মিল নেই। কিন্তু এ ছন্দ শুধু মিলহীন কবিতা নয়। যে ছন্দে শেক্সপিয়ার নাটক লিখেছেন, মিল্টন মহাকাব্য লিখেছেন তারই সঙ্গে যেন এ কাব্যের আত্মীয়তা। রামায়ণ-মহাভারত, চণ্ডী-মনসার পাঁচালী লেখা হয়েছে পয়ারে। যার লাইনগুলোতে চৌদ্দটা করে অক্ষর। আট অক্ষরের পর একবার থামা, আবার লাইনের শেষে একবার থামা। একটা তাল-সুরের মধ্যে এগিয়ে চলত পুরানো দিনের পয়ার। উল্লেখ্য এ পয়ারের চালেই এতদিন কবিতা লেখা হতো।[১২] কিন্তু মাইকেল সৃষ্টি করলেন নতুন ছন্দ এখানে থামার

ব্যাপারটি অন্য ধরনের; লাইনের শেষে থেমে গেলে হবে না। এ যে থামা বা বিরতি, একে পণ্ডিতেরা বলেন যতি। পয়ারে লেখা বাংলা পুরানো কবিতায় আট অক্ষরের পরে যে যতি তাকে বলে অর্ধ যতি, আর লাইনের শেষে পূর্ণ যতি। মধুসূদন পূর্ণ যতিটাকে বদলিয়ে কখনো পরের লাইনে দিয়েছেন।

এ হেন নির্জন স্থানে দেবপুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি?

সত্যিই ঈশ্বরগুপ্ত যা পারেননি মাইকেল তা পারলেন। তিনি সৃষ্টি করলেন নতুন ছন্দ। যতীন্দ্রমোহন আনন্দের সাথে *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্য ১৮৬০ সালে ছাপিয়ে দিলেন। বাংলাদেশ পেল এক নতুন কবিকে। আর এক বন্ধু রাজনারায়ণ বসু কাব্যগ্রন্থটি পড়ে বললেন এ বইয়ের জন্য মধু তুমি একটা পুরস্কার অর্জন করেছ আর তা হলো অমরত্ব। বিদ্যাসাগর তৈরি করেছিলেন বাংলা গদ্যের ধ্বনিস্পন্দন আর মাইকেল সৃষ্টি করলেন বাংলা পদ্যে নতুন ধ্বনিকল্লোল।[১৩] বাংলার মানুষ তিলোত্তমার প্রশংসা করেছেন। অনেকেই বলেছেন নতুন বাংলা কবিতার জন্ম হলো এ কাব্যে। শুধু তাই নয় নতুন প্রজন্মকে আধুনিক চেতনায় অনুপ্রাণিত করবার জন্য এ কাব্য এক অনন্য উদাহরণ।

জীবনের সত্যকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। *মেঘনাদবধ* মহাকাব্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সত্যকে সাহসিকতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। সাফল্য দুর্বলতা সত্ত্বেও *মেঘনাদবধ*ই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য।[১৪] বাংলা সাহিত্যেরও সেরা মহাকাব্য। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্য বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি *মেঘনাদবধ* কাব্য। পুরাণাশ্রিত এ কাব্যে স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্যে অনুরণিত।[১৫] অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্যটি প্রকাশিত হবার পরে প্রায় ১৬৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু পাঠক-সমালোচকদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা কমেনি বরং বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে *মেঘনাদবধ*কে অবলম্বন করেই বাংলাদেশে সাহিত্য-সমালোচনার উদ্ভব। *মেঘনাদবধ* মহাকাব্যের গঠনরীতি বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব এবং অনন্য। শুধু ইতিহাসের দিক থেকে নয়; আখ্যানকাব্যের রসস্বাদের দিক থেকেও এর মূল্য অনেক। নয়টি সর্গের এ মহাকাব্যের কাহিনির সময় মাত্র দুরাত একদিন। এক সন্ধ্যেবেলায় আরম্ভ আর রাত্রি শেষ হবার আগেই মেঘনাদ নিহত। কিন্তু মাইকেল বিচিত্র কৌশলে কাহিনি বলেছেন। এমনভাবে বলেছেন যে আড়াইদিনের কাহিনির মধ্যে বহুকালের কথা এসেছে। কাহিনি ছড়িয়েছে বহুদূর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পর্যন্ত। কখনও লঙ্কাপুরির রাজসভায়, কখনও অন্তঃপুরে, কখনও অশোকবনে, আবার সমুদ্রতলে, পর্বতশৃঙ্গে, কখনও অন্তরিক্ষে, কখনওবা স্বর্গে। কাব্যের একটা বিরাট ভূগোল তৈরি করেছেন মাইকেল।[১৬] *মেঘনাদবধ* কাব্যের কয়েকটি চরণ—

এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।

মধুসূদন ভাবচেতনায় বিদ্রোহী কিন্তু কবি।[১৭] মহাকবি *মেঘনাদবধ* মহাকাব্যে বিদ্রোহী কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। রামায়ণ পড়া বিশ্বাসী মানুষের মনে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিলেন। বাল্মীকি, কালিদাস, তুলসীদাস, কৃত্তিবাস, কম্বনসহ অনেক বড়ো কবিরা রামায়ণ লিখেছেন; সকলেরই নায়ক ছিলেন রাম। কিন্তু মাইকেল রাবণকে করলেন নায়ক। এ কাব্যে রামের চেয়ে রাবণকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করলেন এবং বললেন রামের চেয়ে রাবণ মহান। মধুসূদন রামকে ঘৃণিত বলে ঘোষণা করেছেন।[১৮] তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি ধার্মিকের চোখে রীতিমতো পিলে চমকানোর মতো এবং ধর্মদ্রোহীর মতো। *মেঘনাদবধ* আধুনিক তাই আধুনিক সমাজে তথা নতুন প্রজন্মের কাছে এ কাব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। *মেঘনাদবধ* কাব্যটির বহু সংস্করণ হয়েছিল, মহাকবির জীবদ্দশায় দুবার সংস্করণ হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রি. বাংলার ইতিহাসে দুটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। একটি হলো বাংলা ভাষায় প্রথম সফল ও সার্থক *মেঘনাদবধ* মহাকাব্য রচনা এবং অন্যটি হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য হলো রাধার সুখ-দুঃখের কবিতা। বাংলাদেশের কবিতার একটা বড়ো স্রোতই রাধা-কৃষ্ণের কবিতা। সকলেই অবাক! সাহেব মাইকেল হিন্দু ধর্মত্যাগী মধুসূদন লিখেছেন *ব্রজাঙ্গনা!* ১৮৬১ সালে মধুসূদনের *মেঘনাদবধ* মহাকাব্যের প্রথমভাগ প্রকাশিত হবার পর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলি পাঠ করেছিলেন। বৈষ্ণব-কবিতার কলয়িত নিকুঞ্জ-কাননে ভ্রমণ করতে করতে মধুসূদনের কবি হৃদয় পুলক প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তিনি এ সময়ে গীতি-ছন্দে কোনো কাব্য গ্রন্থ রচনার কথা মনে মনে ভাবছিলেন। ঠিক এমন সময়ে একদিন বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে মধুকে বললেন, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পারো? এ কথা শুনে মধুসূদনের গীতি কবিতা রচনার প্রচ্ছন্ন বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। তিনি কাব্যটি রচনা করলেন। এ কাব্যে ১৮টি কবিতা আছে। কী অনিন্দ্যসুন্দর তাল লয়, মিল, সুর ও ছন্দে রচনা করলেন *ব্রজাঙ্গনা।*

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি, ব্রজের রতন।

চরণ দুটি পড়ে না জানা পাঠকেরা মনে করতে পারেন এটা কোনো বৈষ্ণব মহাজনের গান। মাইকেল আবার পুরানো মহাজনের মতো ভণিতা দিয়েছেন ঈশ্বরগুপ্ত আর ভারতচন্দ্রের মতো নিজের নাম নিয়ে শব্দের আর অর্থের খেলা করেছেন।[১৯]

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন!

মধুসূদনের *ব্রজাঙ্গনা* কাব্য অন্যান্য কাব্য থেকে বিষয় ও ভঙ্গিতে আলাদা। ছন্দের দিক থেকেও অপর তিনটি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে *ব্রজাঙ্গনার* পার্থক্য গুরুতর। এ কাব্য পুরোপুরি মিত্রাক্ষরে রচিত। অনেকেই বললেন অমিত্রাক্ষরের কবি মিল দিতেও জানেন তাহলে! ব্যবসায়ী বৈকুণ্ঠবাবু *ব্রজাঙ্গনা* পাঠে মুগ্ধ হয়েছেন জেনে মধু তাঁকে *ব্রজাঙ্গনার* সমস্ত স্বত্ব দান করেন। আর নবদ্বীপের এক পাঠক *ব্রজাঙ্গনা* পাঠ করে কবিকে দেখতে কলকাতায় এসে মধুকে বলেছিলেন বাবা তুমি শাপভ্রষ্ট। ঠিক তেমনি করে এ

প্রজন্মের অনেক পাঠক *ব্রজাঙ্গনা* পাঠে মুগ্ধ হয়ে মিত্রাক্ষরে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হবেন এটাই স্বাভাবিক।

বীরাঙ্গনা কাব্যের ধরনটি একেবারেই আলাদা। মধ্যযুগীয় সমাজে নারীদের স্থান ছিল নীচে। নারীরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারতেন না। তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। এরা শুধু পুরুষের ভোগের বস্তু ছিল। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রথমে আন্দোলন করেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হলে নারীরা সহমরণের হাত থেকে রক্ষা পান। এর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর অধিকার দিতে ১৮৫৬ সালে নিজের ছেলের সাথে এক বিধবার বিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬২ সালে গৃহবন্দি নারীদের মুক্তি দিতে রচনা করলেন *বীরাঙ্গনা* কাব্যগ্রন্থটি। মধুসূদনের ভাষা এ বীরাঙ্গনা নারীর প্রথম প্রণয়াভূতির মাধুর্যময় চিত্র কোমলতার রঙে অপূর্ব করে তুলেছেন–

> এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পবান দেখি
> মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
> পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে?

বীরাঙ্গনায় আছে অনেকগুলো চিঠি। সবগুলো চিঠিই মহিলাদের। এগুলো তাদের স্বামী অথবা প্রেমিকদের কাছে লেখা।[২০] চিঠি লিখেছেন শকুন্তলা দুষ্মন্তকে, কৈকেয়ী দশরথকে, সূর্পণখা লক্ষণকে, জনা নীলধ্বজকে। এ রকম এগারোটি চিঠি। এ কাব্যগ্রন্থে নারীর চরিত্রে বীরত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর চরিত্রগুলোতে স্বাধীনতা, প্রেম ও প্রাণের প্রবণতা লক্ষণীয়। এ কাব্যগ্রন্থটি মধুসূদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কাব্যগ্রন্থটি মধসূদন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছিলেন।[২১]

বাংলা নাটকেরও আধুনিক রূপদান করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মহাকবি বাংলা নাটকে পাশ্চাত্যকাঠামো প্রবর্তন করেন। *শর্মিষ্ঠা* ও *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের মাধ্যমে তিনি প্রথম পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ধারার সূচনা করেন। প্রহসনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের ভণ্ডামি তুলে ধরেন। একবিংশের প্রজন্ম তাঁর নাটকে নারী জাগরণ, প্রতিবাদী মানসিকতা, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, দেশপ্রেম ও সুস্থ সমাজ গঠনের প্রেরণা পাবে।

বাংলা সাহিত্যকে মধ্যযুগের বৃত্ত থেকে মুক্ত করে আধুনিকরূপ দান করেন মধুসূদন দত্ত। তাঁর উন্নত জীবনদর্শন ও মানবিক মূল্যবোধ আর নতুন ভাবনা ও ছন্দে কাব্য রচনা তৎকালীন সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। আধুনিক প্রজন্মও মধুসূদনের অত্যাধুনিক ধ্যান-ধারণা ও নতুন ছন্দ মনে ধারণ করে সাহিত্য রচনা শুরু করেন। মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বমানের করে তুলেছিলেন। এ পথিকৃৎ বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আজও মধুসূদনের সনেট অনুসরণ করে হাজারও বাঙালি কবি কবিতা লিখছেন। মদুসূদন দত্তের সাহিত্যপ্রেম বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে যেমন পরিপূর্ণ করেছে তেমনি নতুন প্রজন্মকে সাহিত্যানুরাগী করেছেন। কবির জীবনের শেষদিকে তিনি দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় জ্বললেও তাঁর সাহিত্যকীর্তি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সুতরাং যতদিন বাংলা ভাষার ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন বাংলা সাহিত্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বল-জ্বল করবে।

তথ্যসূত্র

১. ক্ষেত্র গুপ্ত, মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প, এ. কে সরকার এ্যান্ড কোং, কোলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭, পৃ. ১।

২. পূর্বোক্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ২।

৩. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত : তাঁর অবদান অতুলনীয়, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৫।

৪. আমিরুর আলম খান, মধুসূদনের বিশ্ব জয়, মধুসূদন জন্মবার্ষিকী ও মধুমেলা, ২০০৮, পৃ. ৩৮।

৫. আনসার উল হক, মধুসূদনের সাহিত্যঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে, মধুকর, ২০১৭, পৃ. ৩৫।

৬. শাহ্ মো. গোলাম মোর্শেদ, মধুসূদন ও দেশ প্রেম, মধুসূদন জন্মবার্ষিকী ও মধুমেলা ২০০৮, পৃ. ৪৩।

৭ গোলাম মুরশিদ , হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩০১।

৮. পূর্বোক্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ২০।

৯. পূর্বোক্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ৩২৫ ও ৩২৬।

১০. যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ১৮৯৩ পৃ. ১৮৬।

১১. শিশিরকুমার দাশ, মাইকেল, কোলকাতা, প্যাপিরাস, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ২৭।

১২. পূবোক্ত, শিশিরকুমার দাশ, পৃ. ২৮।

১৩. পুর্বোক্ত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১৯৫।

১৪. পূর্বোক্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ১১১।

১৫. খসরু পারভেজ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যে স্বদেশ ও সাগরদাঁড়ি, লিরিক, মধুসূদন জন্মবার্ষিকী-২০০৯, কাসেদুজ্জামান সেলিম সম্পাদিত, যশোর, পৃ. ৮।

১৬. পূর্বোক্ত, শিশিরকুমার দাশ, পৃ. ৪১।

১৭. শিশিরকুমার দাশ, মধুসূদনের কবিমানস, প্রথম এবং মুশায়েরা, কোলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৪০।

১৮. পূর্বোক্ত, ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃ. ৮৭।

১৯. পূর্বোক্ত, শিশিরকুমার দাশ, পু. ৫০।

২০. গোলাম মুরশিদ, আশার ছলনে ভুলি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. জানুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ২১৬।

২১. পূর্বোক্ত, শিশিরকুমার দাশ, পৃ. ৪২।

প্রফেসর ড. সবুজ শামীম আহ্সান: বিভাগীয় প্রধান, সমাজকর্ম বিভাগ, যশোর সরকারি সিটি কলেজ

নিবন্ধ

বাংলা সাহিত্য নিয়ে কবি জসীমউদ্‌দীনের ভাবনা

ড. কুদরত-ই-হুদা

জসীমউদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করতেন– দেশি এবং বিদেশি। বিদেশি সাহিত্য বলতে তিনি বিদেশিদের রচিত সাহিত্যকেই শুধু বোঝাতেন না। নিজের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে বিদেশি ভাবধারা নিয়ে রচিত সাহিত্যকে তিনি বিদেশি সাহিত্য হিসেবে গণ্য করতেন। এই হিসেবে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের রচনাকে দেশি ভাষায় রচিত বিদেশি সাহিত্য হিসেবে দেখতেন।

খাঁটি বাংলা সাহিত্য খুঁজে বের করতে জসীমউদ্‌দীন দুটি মোক্ষম জায়গায় হাত দিয়েছিলেন। এক, ভাবগতভাবে বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় চেতনার প্রবেশ এবং দুই, ভাষাগতভাবে সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক আমদানি। জসীমউদ্‌দীনের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা ও তাঁর নিজের সাহিত্যকর্ম এই দুইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

একটা জাতি যখন অন্য একটি জাতি দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন বাইরে থেকে বিষয়টি কেবল ভূখণ্ডগত আর শাসন-শোষণগত মনে হয়। এটি মূলত উপনিবেশের বাইরের চেহারা। কিন্তু ভেতরের চেহারা অন্যরকম। ঔপনিবেশিক শক্তি যখন আসে, তখন সাথে নিয়ে আসে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সভ্যতার ধারণা। উপনিবেশিতের সভ্যতার ধারণার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সভ্যতার ধারণার তখন শুরু হয় দ্বিপাক্ষিক সংঘর্ষ। এই ঠেলাঠেলিতে সংগত কারণেই ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে ঔপনিবেশিক শক্তির সভ্যতা-সংস্কৃতি। কারণ, এর পেছনে থাকে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য। জসীমউদ্‌দীন বিষয়টি বুঝতেন। তিনি এও বুঝতেন যে, উপনিবেশিত অঞ্চলে ঔপনিবেশিক চিন্তা ও সংস্কৃতি-সভ্যতা টিকে থাকে নতুন ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য শ্রেণির মগজে ও কলমের ডগায়। বাংলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইউরোপীয় চিন্তা আর সংস্কৃতি বাংলা অঞ্চলে দাপুটে হয়ে উঠেছে উনিশ শতকে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির মগজ ও কলমের মাধ্যমে। জসীমউদ্‌দীন বলেছেন, 'কলিকাতায় তাঁরা (ইংরেজ) নতুন নগর পত্তন করলেন, হিন্দু-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের দল এখানে এসে আস্তানা তুলল। ইংরেজের নতুন সভ্যতা এঁরা চোখ বুজে গ্রহণ করলেন। ... নতুন যে মধ্যবিত্ত-হিন্দু-দলটি শহরে এসে আস্তানা তুলল, তাতে শহরে তাদের নিজস্ব কোনো Tradition-এর বনিয়াদ ছিল না। সেইজন্য ইংরাজের নগরে এসে তারা ইউরোপীয় ভাবধারার পানপাত্রটি পরিপূর্ণ মনে শুধু গ্রহণই করল না, নিজের দেশের গ্রাম্য-জীবনের সেই প্রাচীন ভাবধারার বনিয়াদকে লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো'।

প্রকৃতপক্ষে, উনিশ শতকের নতুন এই সাহিত্যিক শ্রেণি ছিলেন দেশের বিপুল সংখ্যক গণমানুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ফলে, যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে, ইউরোপীয় জীবনচেতনার আলো যে-মুষ্টিমেয় কলকাতা নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত শ্রেণির ওপর পড়ল তাদের অনুভূতির বয়ান তাদেরই নতুন বাংলা ভাষায় রূপায়িত হতে থাকল। বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠল নতুন ভাব ও ভাষার আকর। এই নতুন ভাবের নাম হলো 'মহৎ-ভাব', 'উন্নত-ভাব'। আর নতুন ভাষার নাম হলো 'মহৎ-ভাষা', 'উন্নত-ভাষা'। আপামর জনসাধারণের মনের মধ্যে খেলে যাওয়া ভাব আর তাদের ব্যবহৃত ভাষা বাংলা সাহিত্য থেকে দূর হয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়– যিনি মূলত নতুন সাহিত্যিক শ্রেণির প্রথম দিককার প্রধান সেনাপতি– নিজেই রায় দিলেন যে, জনমানুষের মুখের কাছাকাছি ভাষায় গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত নয়। কেননা তা 'উন্নত' নয়; 'উন্নত ভাব' প্রকাশের ক্ষমতা তার নেই।

বাংলা সাহিত্য ঔপনিবেশিক পর্বে ঢোকার ফলে এর কয়েকটি গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত, এটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে মুষ্টিমেয় অভিজাত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য জীবনচেতনা দ্বারা স্নাত হয়েছে। তৃতীয়ত, পূর্বতন সাহিত্য

ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। চতুর্থত, আঙ্গিকের নানামাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঋদ্ধ হয়েছে। পঞ্চমত, সাহিত্য শ্রুতির বিষয় থেকে শুধু পাঠ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ষষ্ঠত, বহুমানুষের সম্মিলিত উপভোগ থেকে সাহিত্য ব্যক্তির প্রাইভেট উপভোগের দরজা খুলে দিয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের নিজের সাহিত্যকর্ম এবং সাহিত্যতত্ত্ব এইসব পরিবর্তনের উজানে চলেছে সবসময়। জসীমউদ্‌দীন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যমুনার উজান স্রোতের নাম।

জসীমউদ্‌দীনের কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ তাঁর বাল্যকালেই। তাঁর কবি হয়ে ওঠার যে বর্ণনা তিনি জীবনকথা গ্রন্থে দিয়েছেন তা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। তখন জসীমউদ্‌দীনের বয়স সাত-আট বৎসর। চাচার বিয়ের বরযাত্রী হয়ে গেলেন শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম। পাশের গ্রামে পরদিন ঢোলের বাদ্য শুনে সেই শব্দ ধরে হাজির হন। 'সেখানে দুইদল কবি-গায়কের মধ্যে পালা হইতেছিল। ... কবিয়ালেরা যখন তাল-ছন্দ ঠিক রাখিয়া একটি পদের সঙ্গে অপর পদের মিল দিয়া উপস্থিত বোল তৈরি করিতেছিল, সেই মিলের আনন্দে আমার সর্ব দেহ-মন আলোড়িত হইতেছিল। ... গানের একটি ধুয়া বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে আমি বিবাহ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।'

এভাবেই তাঁর কবি হয়ে ওঠা। কবিয়ালের গর্ভ থেকে জসীমউদ্‌দীন কবি হয়ে উঠেছেন। তাঁর পরবর্তী কবি জীবনে এবং সৃষ্টিশীল সত্তায় এই কবিগান এবং অসংখ্য কবিয়ালের প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জসীমউদ্‌দীনের কবিতার সাবলীলতা এবং ছন্দের সহজ গতির প্রশংসা করলে তিনি বলেছিলেন– 'ইহা যদি আমার গুণ হইয়া থাকে তবে এই শিক্ষা আমি পাইয়াছি আমার দেশের অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কবিয়ালদের কাছ থেকে। তাহারাই আমার কাব্য জীবনের প্রথম গুরু। সেই যাদব, পরীক্ষিত, ইসমাইল, হরি পাটনী, হরি আচার্য এঁদের কথা আমি যখন ভাবি আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হইয়া ওঠে।'

এমনকি যে 'কবর' কবিতা জসীমউদ্‌দীনকে অল্প বয়সে অতুলনীয় কবি-স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, সেই কবিতার সাদৃশ্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক অখ্যাত কবিয়াল হরি আচার্যের রচনায়। একথা তিনি হরি আচার্যের কাছে স্বীকারও করেছেন। হরি আচার্যকে তিনি তাঁর 'পরিণত বয়সে' বলেছিলেন– "আপনার রচিত নিমাই সন্ন্যাস গানটি যদি আমি আগে শুনিতাম তবে হয়তো আমার 'কবর' কবিতা রচনা করিতাম না। আপনার নিমাই সন্ন্যাস যে-আসরে গীত হয়, শ্রোতারা কাঁদিয়া বুক ভাসায়"।

সুতরাং জসীমউদ্‌দীনের কবি-প্রতিভার গঠনে দেশীয় গণমানুষের কাব্যরস-পিপাসা-মেটানো-সাহিত্যধারা এবং এর রচয়িতাদের রয়েছে এক ব্যাপক প্রভাব। তিনি বাংলা সাহিত্য বলতে বুঝতেন ওই বহুমানুষের ভোগ-উপভোগের সাথে সম্পৃক্ত সাহিত্যকে।

উপনিবেশ আমলের কাব্যধারা বাদ দিলে এর পূর্বের সকল কাব্যই রচিত হতো গণমানুষের উপভোগের জন্য। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র সবার রচনাই বহুমানুষের কাব্যরস পিপাসা নিবৃত করেছে। গণমানুষের উপভোগের জন্য রচিত হতো বলে জসীমউদ্‌দীন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে বলতে চান 'গণ-সাহিত্য' ও খাঁটি বাংলা সাহিত্য।

জসীমউদ্‌দীন আজীবন নিজেকে বাংলা সাহিত্যের মূলধারার সাহিত্যিক মনে করতেন। বলতেন, তিনিই বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মানুষের রুচি-চিন্তা ও নন্দনের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনিই খাঁটি বাংলা ভাষার কবি। কিন্তু বাংলা সাহিত্য জসীমউদ্‌দীনের সেই ধারায় এগিয়ে যায়নি। ইউরোপীয় ধারারই এখানে জয়জয়কার। তবে একথা সত্য যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুইশ বছরের সাধনার মধ্যে ঔপনিবেশিক সাহিত্যধারা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা কমবেশি কারো কারো মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছে। বাংলা সাহিত্য কোথাও কোথাও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কোশেশ করেছে এবং করছেও। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এইসব প্রচেষ্টা আসলে তাত্ত্বিকভাবে জসীমউদ্‌দীনের সাধনারই সমীপবর্তী। সম্ভবত সাহিত্যে আর চিন্তায় যখনই আমরা উপনিবেশ বিরোধিতার কথা বলি তখনই জসীমউদ্‌দীনের 'দেশি বাংলা সাহিত্যের' ধারণা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ফলে জসীমউদ্‌দীন পুরাতন নন, মৃত নন। তিনি উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্য-সংগ্রামের এই যুগের প্রধানতম নকিব।

ড. কুদরত-ই-হুদা: গবেষক ও শিক্ষাবিদ

শীতকালীন উৎসব ও গ্রামীণ মেলা

মাসুম আওয়াল

উৎসব বলতে সাধারণত সামাজিক, ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে পালিত আনন্দ অনুষ্ঠানকে বোঝায়। বাংলাদেশে উৎসবের সময় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে। বাঙালিরা উৎসবপ্রিয় জাতি। বাংলাদেশে উৎসবকে ঘিরে ‘বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ’ ও ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’-এর মতোন স্লোগানও আছে। অন্যদিকে মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন, একত্রিত হওয়া। মেলা হলো বাংলাদেশের লৌকিক ও জনপ্রিয় উৎসব। এদেশে মেলার উৎপত্তি হয়েছে মূলত গ্রাম-সংস্কৃতি থেকে। তবে কবে, কীভাবে এদেশে মেলার উৎপত্তি হয়েছে তা সঠিক করে বলার উপায় নেই। গবেষকদের মতে বাংলায় নানা ধরনের ধর্মীয় নৃত্যানুষ্ঠান ও উৎসবের সূত্র ধরেই মেলার উৎপত্তি হয়েছে। সেদিক দিয়ে এদেশের মেলার প্রাচীনত্ব হাজার বছরেরও অধিক পুরানো।

এদেশের প্রাচীন পর্যায়ের উৎসব ও নৃত্যানুষ্ঠানকেন্দ্রিক মেলাগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে জীবনধারণের আহার্য কৃষিশস্য এবং বিশেষ করে কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রোদ ও বৃষ্টির কথা। বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম-শহরজুড়ে প্রতিবছর প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচলিত প্রতিটি মেলা আয়োজনের পশ্চাতে কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সেটি হয় ধর্মীয়, নয় ব্রত-পালা-পার্বণ বা যে-কোনো একটি নির্ধারিত বিষয় বা ঐতিহ্যকে স্মরণ করে। তবে মেলার বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে– ব্যবহার্য পণ্য ও গৃহ সামগ্রীর বিরাট সমাবেশ এবং চিত্তবিনোদনের জন্যে যাত্রা, সার্কাস, পুতুলনাচ ইত্যাদির আসর।

এই নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করব শীতকালীন উৎসব ও গ্রামীণ মেলা সংস্কৃতির কথা। বাংলার ঋতুচক্রে শীত এমন এক ঋতু যা শুধু ঠান্ডার জন্য নয়, বরং আনন্দ, মিলন ও উৎসবের জন্যও মানুষের মনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শীতের সকালে কুয়াশা ঢাকা মাঠ, গাছের পাতায় শিশিরবিন্দু, আর ঘরের আঙিনায় ধোঁয়া ওঠা পিঠা সব মিলিয়ে এ যেন বাংলার প্রাণের ঋতু। এই ঋতুতেই দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয় গ্রামীণ মেলা, উৎসব ও সামাজিক মিলনমেলা– যা আমাদের চিরায়ত সংস্কৃতির এক অনন্য পরিচায়ক।

শীতের আনন্দ ও গ্রামীণ উৎসব

গ্রামবাংলা বরাবরই উৎসবপ্রিয়। শীতকাল এলে সেই আনন্দ যেন আরও বেড়ে যায়। এর প্রমাণ মেলে মোকারম হোসেনের বাংলাদেশের মেলা বইয়ে। এই বইটিতে শুধু পৌষ ও মাঘ মাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২৫৫টি মেলার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে পৌষ মাসে ১০৭টি এবং মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত হয় ১৪৮টি মেলা। বাগেরহাটের খাঞ্জেলীর মেলা, মৌলভীবাজারের মাছের মেলা, মাগুরার ঘোড়দৌড়ের মেলা, চট্টগ্রামের

মাইজভাণ্ডারীর মেলা, বগুড়ার পোড়াদহের মাছের মেলা ইত্যাদি বড়ো বড়ো মেলাগুলো মোটামুটি সবই শীতকালে অনুষ্ঠিত হয়।

কেন শীতকালে এত মেলা হয়? কারণ এই সময় কৃষকরা ধানের গোলা ভরে মাঠের ফসল তুলে। ঘরে আসে নতুন চাল, নতুন আশা। এই ফসলের সুখ ভাগাভাগি করতেই গ্রামে শুরু হয় নবান্ন উৎসব, পৌষসংক্রান্তি, পিঠাপুলি মেলা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গ্রামীণ নারীরা একত্রে বসে তৈরি করেন দুধ-চালের পায়েস, চিতই, ভাপা, পাটিসাপটা, দুধপুলি, আর চালের গুঁড়ো আর গুড়ের মিষ্টি ঘ্রাণে মুখর হয়ে ওঠে প্রতিটি উঠান। এই খাবারগুলোর সাথে থাকে গল্প, হাসি, গান– সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক প্রাণবন্ত সামাজিক বন্ধন।

মেলা গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রাণ

বাংলার গ্রামীণ মেলাগুলো শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এগুলো এক বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমও বটে। কোনো মেলা বসে মন্দির বা মাজারকে কেন্দ্র করে, আবার কোথাও বসে ফসল তোলার আনন্দ ভাগাভাগি করতে। শীতের এই মেলাগুলোতে দেখা মেলে বাউল, ভাটিয়ালি, পালাগান, যাত্রাপালা, সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা এবং নানা দেশজ হস্তশিল্পের প্রদর্শনী। গ্রামীণ শিল্পীরা তাঁদের হাতের তৈরি বাঁশ-বেতের সামগ্রী, মাটির পাত্র, পুতুল, গয়না, কিংবা লোকশিল্পের সামগ্রী বিক্রি করেন। এতে যেমন তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়, তেমনি ঐতিহ্যও বাঁচে।

কেমন করে হলো এসব মেলার উৎপত্তি? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, আজ থেকে ষাট-সত্তর কিংবা একশো বছর পূর্বে গ্রামে অনেক মেলা আয়োজনের নেতৃত্ব দিতেন জমিদারেরা। নিজেদের জমিদারি এস্টেটে বড়ো বড়ো মেলা আয়োজন কখনো কখনো প্রতিযোগিতার পর্যায়ে চলে যেত। মূলত আরো অন্যান্য বিষয়ের মতো বড়ো মেলার আয়োজন তাদের জন্য ছিল শানশওকতের এক ধরনের প্রদর্শনী। মেজর সেরউইল-এর বর্ণনাতে পাওয়া যায়, হরিপুর এবং মালদুয়ারের জমিদারগণ নেকমরদের মেলার মালিক ছিলেন। এই মেলায় দার্জিলিং এবং আসাম থেকে যে হাতি আসত বিক্রয়ের জন্য তার ক্রেতা ছিলেন এই দুই জমিদার। এছাড়া দিনাজপুরের জমিদার, রংপুরের কাকিনা এবং তাজহাটের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত বড়ো এবং বিখ্যাত মেলাগুলোর সোনালি দিনের গল্প এখনো শোনা যায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রবীণ মানুষদের মুখে মুখে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, রংপুর অঞ্চলের শ্যামপুরের জমিদার শ্যামাপ্রসাদ রায়

চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হতো বদরগঞ্জের মেলা। এখনো এই মেলাটি সচল রয়েছে। এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় জমিদার ও জোদ্দারদের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হতো বিভিন্ন মেলা– যার কোনো কোনোগুলো এখনো সচল রয়েছে।

লোকসংগীত ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন

শীতের মেলাগুলোতে সন্ধ্যা নামলে বাজতে থাকে দোতারা, একতারা, ঢোল আর করতালের সুর। বাউল, মারফতি, লালনের গান কিংবা জারি-সারি সংগীতের আসর বসে খোলা মাঠে। এসব

গান শুধু বিনোদন নয়; মানুষের ভাবনা, বিশ্বাস, প্রেম ও সমাজচেতনার গভীর প্রতিফলন। এইসব অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মকে আমাদের শিকড়ের সাথে যুক্ত করে রাখে। শহুরে জীবনের কোলাহল পেরিয়ে গ্রামীণ এই মেলাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা এক ঐতিহ্যের সন্তান, আমাদের সংস্কৃতি এক উষ্ণ মানবিক বন্ধনের প্রতীক। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসে নানারকম শীতকালীন মেলা। গাজীপুরের টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সমাবেশ। জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ পৌষ মেলা ও রাজশাহী-নাটোরের নবান্ন উৎসব নতুন ফসলের আনন্দে উদ্‌যাপিত হয়। সাতক্ষীরার সুন্দরবন সংলগ্ন দুপুরিয়া মেলা বনজীবী ও জেলেদের প্রাণের উৎসব। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি পণ্য মেলা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও পণ্যের প্রদর্শনী। সিলেটের শাহজালাল ও শাহপরান (রহ.) উরস মেলা ধর্মীয় ও লোকজ সংস্কৃতির অনন্য সমন্বয়।

হয়েছে নগরে। যেহেতু এটি ইতোমধ্যে গ্রাম থেকে নগরে এসে পড়েছে তাই এতে যুক্ত হয়েছে কিছু নাগরিক উপাদান। এখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পৌষ মেলা নাগরিক বিনোদনের একটি বড়ো মাধ্যম হয়ে উঠেছে। শহরগুলোতে শীতের মেলা হিসেবে সাধারণত পৌষমেলাই আয়োজন করা হয়। এছাড়া তেমন কোনো মেলা চোখে পড়ে না। আজ থেকে এক দশক পূর্বেও মফস্বল শহরগুলোতে পৌষ মেলার আয়োজন করা হতো স্থানীয়ভাবে, চাঁদা তুলে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের স্পন্সরশিপের কারণে এখন আর স্থানীয়ভাবে চাঁদা তুলে আয়োজন করতে হয় না বেশিরভাগ মেলা। বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে এসব মেলাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। এই কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় নগরকেন্দ্রিক মেলার চেহারা একটু ভিন্ন হয়ে গেছে। যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন নাগরিক অনুষঙ্গের পাশাপাশি হাইটেক অনুষঙ্গও। এই প্রক্রিয়াটি ভালো কি মন্দ সেটা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, নগরের মেলা মানেই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের বা কর্পোরেট গ্রুপের আয়োজিত একেকটা উৎসব। এগুলোতে বৈচিত্র্য তেমন না থাকলেও ভিন্ন ধরনের একটা স্বাদ আছে। অনেক দর্শক-ক্রেতা আসে এসব মেলায়। ক্রয়বিক্রয় হয় বিভিন্ন দ্রব্যের।

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা

আজকাল প্রযুক্তির যুগে অনেক মেলা হারিয়ে যাচ্ছে, বা আধুনিক বিনোদনের ভিড়ে গুরুত্ব হারাচ্ছে। তবু যেসব স্থানে এই মেলাগুলো এখনও আয়োজন করা হয়, সেখানে মানুষের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে– গ্রামীণ উৎসব এখনো বেঁচে আছে মানুষের হৃদয়ে। আমাদের উচিত এই ঐতিহ্য ধরে রাখা, তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করা। কারণ গ্রামীণ মেলা কেবল আনন্দের নয়, এটি আমাদের ইতিহাস, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন।

নগরে গ্রামীণ মেলা

এবার আসা যাক আমাদের বর্তমান নগরকেন্দ্রিক মেলার কথায়। আমাদের শহরের অধিবাসীরা মনপ্রাণে শতভাগ নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি বলে এখনো তাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়োজন হয় গ্রামীণ আবহ। মূলত মেলার গ্রামীণ ধরনকে তুলে আনা

শীতের উৎসব ও গ্রামীণ মেলা আমাদের সামাজিক জীবনের প্রাণ। এই উৎসবের উচ্ছ্বাসে মানুষ ভুলে যায় কষ্ট, দুঃখ ও বিভেদ। মেলা মানুষকে একত্র করে, শেখায় সহমর্মিতা ও ভালোবাসা। তাই শীতের এই উৎসব কেবল ঋতুর পরিবর্তন নয়– এটি আমাদের হৃদয়ের উষ্ণতার প্রকাশ, আমাদের সংস্কৃতির অমূল্য ঐতিহ্য।

মাসুম আওয়াল: সম্পাদক, ছোটবেলা, masum.awal1@gmail.com

শীতের সবজি: উপকারিতা ও সতর্কতা

লিনা আকতার

শীতকালেই দেখা যায় নানা ধরনের সবজি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, মটরশুটি, মুলা, গাজর, টমেটো, ধনেপাতা ও পালংশাক ইত্যাদি নানা ধরনের সবজি পাওয়া যায়। এসব সবজি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি পুষ্টিগুণসম্পন্ন। এসব সবজিতে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, খনিজ, ফাইটোকেমিক্যাল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে থাকে, যা শীত মৌসুমের নানা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে রোগ প্রতিরোধকে শক্তিশালী করে। এসব সবজির উপকারিতা থাকলেও এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি রান্নার পদ্ধতির ভুল হয়ে থাকে। রান্নায় তাপের প্রভাব দুটি কারণের ওপর নির্ভর করে পুষ্টির মান পরিবর্তন হতে পারে। এক আপনি কতটা তাপে রান্না করছেন এবং অপরটি কতক্ষণ রান্না করছেন। কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করলে এর কিছু পুষ্টির মানের ওপর প্রভাব ফেলে। আবার দীর্ঘ সময়ের জন্য রান্না করলে ভিটামিন, খনিজগুলো ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশির ভাগ পুষ্টি হারিয়ে যায়। এছাড়া সব রান্নার পদ্ধতি পুষ্টির ওপর একই প্রভাব ফেলবে না। যেমন মাইক্রোওয়েভে সাধারণত কম পরিমাণে পুষ্টির ক্ষতি হয়, স্টিমিং বা ভাপে মাঝারি এবং ফুটন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়।

শাকসবজি রান্নায় আরো দুটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ, একটি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (যেমন- ভিটামিন বি, সি) অপরটি চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (যেমন- ভিটামিন এ, ডি, ই, কে)। পানিতে দ্রবণীয় শাকসবজিগুলো পানিতে রান্না করলে সেই ভিটামিন কিছু পানিতে মিশে সেই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অক্ষুণ্ন রেখে শোষণযোগ্য করে তোলে। আবার চর্বিতে দ্রবণীয় খাবারগুলো চর্বিতে রান্না করলে আরো শোষণযোগ্য করে তুলবে।

গাজর: শীতকালে ঠান্ডা লাগার বিরুদ্ধে এবং ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে গাজর একটি উপকারী খাবার। গাজরে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন যা ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়ে দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। গাজরে থাকা ভিটামিন সি, লুটেইন, জেক্সানথিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট– এগুলো চোখ ভালো রাখতে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া গাজরে ক্যালরি কম ও ফাইবার বেশি থাকায় ওজন কমাতে, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে, কোলেস্টেরল কমাতে ও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সপ্তাহে দুইবারের বেশি গাজর খেয়েছেন তাদের গ্লুকোমা হওয়ার আশঙ্কা তাদের তুলনায় ৬৪ শতাংশ কম ছিল যারা সপ্তাহে ১ বার মাত্র খেয়েছিলেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিটা-ক্যারোটিনের শোষণ কাঁচা গাজর থেকে ৬.৫ গুণ বেশি ভাজা গাজরে। এছাড়া অল্প সময় ধরে একে সিদ্ধ করলে এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ঘনত্ব বাড়ে। তাই কাঁচা গাজরের তুলনায় ভাজা বা সিদ্ধ খেলে এর শোষণ বাড়বে। আবার কাঁচা গাজর কারো ক্ষেত্রে উপকার। কাঁচা গাজরে চিনির পরিমাণ কম থাকে। তাই যাদের ডায়াবেটিস আছে বা ওজন কমাতে চান তারা কাঁচা গাজর খেতে পারেন। তবে অবশ্যই পরিমাণমতো।

ক্রুসিফেরাস সবজি: ক্রুসিফেরাস সবজি বলতে কপি জাতীয় যেসব খাবার যেমন– ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি ইত্যাদি। এসব সবজিতে গ্লুকোসিনোলেট ও কার্বন-৩ ইন্ডোল নামে দুটি যৌগ রয়েছে যা বিভিন্ন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং মহিলাদের ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া এতে রয়েছে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার যা অন্ত্রের জন্য ভালো। এতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধে ও আয়রন শোষণে ভালো রাখতে সাহায্য করে। ক্রুসিফেরাস সবজিতে ভিটামিন কে হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এছাড়া রয়েছে ভিটামিন বি-৬ বা ফোলেট, যা গর্ভবতী নারীদেরও সন্তানের জন্মগত ত্রুটির আশঙ্কা কমাতে সাহায্য করে এবং আলঝেইমার রোগের আশঙ্কা কমায়। ক্রুসিফেরাস সবজিগুলোতে ক্যালরি কম ও ফাইবার ভালো থাকায় এগুলো ওজন কমাতে, টাইপ-টু ডায়াবেটিস কমাতে, ত্বকের জন্য ও কোলেস্টেরল কমাতে ও লিভারের জন্য উপকারী। এজন্য খাদ্যতালিকায় প্রতিদিন আধা কাপ বা ভাপানো বা হালকা রান্না করে ক্রুসিফেরাস সবজি খান। এসব সবজিতে আছে ভিটামিন কে এবং ক্যারোটিনয়েড, যা সাধারণত তাপের সংস্পর্শে দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আবার সিদ্ধ ফুলকপিতে ভাপানো ফুলকপির তুলনায় গ্লুকোসিনোলেট, পলিফেনল ও ফ্ল্যাভোনয়েডের পরিমাণ কম থাকে। এছাড়া বাষ্প বা স্টিম করলে এসব সবজির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভালো পাওয়া যায়। আলতোভাবে ভাজলে পুষ্টির মান বেশি অক্ষত থাকে। কারণ রান্নাপদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ভাজা ক্রুসিফেরাস সবজি মিথানোলিক নির্যাস বজায় রাখে এবং সর্বোচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়া অপর আরেকটি রান্না সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো চুলার উপর অল্প পানি, লেবুর রস, তেল দিয়ে আলতো করে ভাজলে এর পুষ্টিমানকে আরও শোষণযোগ্য করে তুলবে।

টমেটো: টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যেমন– বিটা-ক্যারোটিন যা ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, লাইকোপেন ইত্যাদি। এগুলো হৃদরোগের উন্নতি, চোখের স্বাস্থ্যের উন্নতি, কিছু ক্যান্সার, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে ও ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া টমেটোতে ভিটামিন কে, পটাশিয়াম রয়েছে যা আমাদের বেশির ভাগ ব্যক্তির ঘাটতি রয়েছে। এগুলো হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও রক্তজমাট বাধতে ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে ও কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। ১ কাপ টমেটোর রসে ৫৩৪ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। এটি কাঁচা বা ভাপে খেলে লাইকোপেনের সর্বাধিক পুষ্টি পাবেন না। টমেটোতে থাকা লাইকোপেনের সর্বাধিক পেতে হলে সেগুলো রান্না করে খেতে হবে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, টমেটোকে অলিভ অয়েলে ভাজানো হলে লাইকোপেনের মাত্রা প্রায় ৮০ শতাংশ বেড়ে যায়। অপরপক্ষে একটি অসুবিধা হলো একে দুই মিনিটের জন্য রান্না করা হলে ১০ শতাংশ ভিটামিন সি কমে যায়। আবার দুই মিনিটের জন্য টমেটো রান্না করলে প্রায় ৫৪ শতাংশ বেশি লাইকোপেন বেড়ে যায়, ৩০ মিনিট পরে আরো ১৬ শতাংশ বেশি। লাইকোপেনের পুষ্টি বোঝার জন্য গবেষকরা বলেছেন, টমেটোকে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় কমপক্ষে দুই ঘণ্টা গরম করলে ভালোভাবে ছেড়ে দেয়। এককাপ রান্না করা টমেটোতে ৪৬০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে, যা দৈনিক সোডিয়াম গ্রহণের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। তাই অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না। এছাড়া কাঁচা টমেটো প্রচুর পরিমাণে খেলে দাঁতের এনামেল ক্ষতি করতে পারে। তাই খাওয়ার সাথে সাথে ব্রাশ করা উচিত। রান্না

করা টমেটো কাঁচা টমেটো থেকে এসিটিক, তাই রান্না করার সময় সামান্য বেকিং সোডা যোগ করতে পারেন অ্যাসিড বা অম্লতা কমাতে। তাই সব মিলিয়ে কাঁচা বা রান্না যাই করুক না কেন শরীরের অবস্থা বুঝে খেতে হবে।

মটরশুটি: মটরশুটিতে ক্যালরি কম ও ফ্যাট কম থাকায় ওজন কমাতে ও ডায়াবেটিস রোগীদের ও হার্টের রোগীদের জন্য উপকারী। এছাড়া রয়েছে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন বি-৬, ফোলেট ও পটাশিয়াম; যা হজমশক্তি বৃদ্ধি, কোলেস্টেরল কমাতে, হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে পলিফেনল যা পাকস্থলি ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। মটরশুটিকে ভাজা, সিদ্ধ করার চেয়ে স্টিম করলে এর ভিটামিন সি নষ্ট কম হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মটরশুটিকে ভাজলে ৮৭ শতাংশ ভিটামিন সি নষ্ট হয় আবার সিদ্ধ করলে ৪৮ শতাংশ নষ্ট হয়, আর ৫ মিনিটের জন্য স্টিম করলে ৩২ শতাংশ ভিটামিন সি নষ্ট হয়। তাই অধিক সময় ধরে এটিকে রান্না না করার পরামর্শ।

পালংশাক: পালংশাক এ কার্বোহাইড্রেট ও ক্যালরি কম থাকে যা রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে, ওজন কমাতে, কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া ত্বকের সংক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। এতে রয়েছে বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি, আয়রন ও ক্যালসিয়াম, ফোলেট যা শিশুর বুদ্ধি ও বিকাশে, জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধে ও রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকে। আধাকাপ রান্না করা পালংশাকে ১০০ মাইক্রোগ্রাম ফোলেট থাকে। তবে ১০ মিনিট সিদ্ধ করলে ৫৮ শতাংশ ফোলেট নষ্ট হয়, যেখানে ভাজার ফলে ৫০ শতাংশ ক্ষতি হয়। আবার ৫ মিনিটের জন্য ভাপিয়ে রান্না করলে ফোলেটের কোনো ক্ষতি হয় না। তাই পালংশাক রান্না করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বাষ্প করা।

বেশির ভাগ মানুষ জানে না কিছু সবজি খোসাসহ খাওয়ার উপকারিতা। একটি সবজিতে থাকা মোট ফাইবারের ৩১ শতাংশ পর্যন্ত সবজির খোসায় পাওয়া যায়। আর এই ফাইবার দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের সন্তুষ্টি রাখবে, যা ক্ষুধা কমাতে বিশেষভাবে কার্যকর। এছাড়া সবজির খোসায় ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট থাকে; যা ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, ইরেক্টাইল ডিসফাংশন এবং আর্থ্রাটিস প্রতিরোধ করে। চামড়াসহ খাওয়া যায় এমন সবজি বেগুন, শিম, মুলা, গাজর, বিট, মিষ্টিআলু, শসা, আলু ইত্যাদি। তবে খোসাসহ খেলে খুব ভালোভাবে চলমান পানিতে ধুয়ে নিবেন কিংবা নিরাপদ করে খাবেন। কেননা এতে ময়লা, জীবাণু ও কীটনাশক থাকতে পারে। এক্ষেত্রে কীটনাশক দূর করতে কিছু উপায় আছে। গবেষণায় দেখা গেছে, খাওয়ার আগে সবজিগুলো ৩০ মিনিট লবণ পানিতে রাখলে চামড়ায় কীটনাশক দূর হয় সহজে। এছাড়া বেকিং সোডা ২ চা চামচ ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে অতি সহজে কীটনাশক দূর হয়।

সতর্কতা

১। যাদের থাইরয়েড সমস্যা, রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান এবং আইবিএস রোগীরা কাঁচা এবং অতিরিক্ত ক্রুসিফেরাস সবজি খাবেন না।

২। শিশুরা প্রচুর পরিমাণে গাজরের রস খাবে না। এতে দাঁতের ক্ষয় ও ত্বক হলুদ হতে পারে। এছাড়া ডায়াবেটিস রোগীরা অতিরিক্ত রান্না করা গাজর খাবেন না।

৩। যাদের অ্যাসিডিটি সমস্যা, জিইআরডি, আইবিএস, কিডনিতে পাথর সমস্যা, দীর্ঘদিন আর্থ্রাইটাইটিস বা প্রদাহজনিত সমস্যা আছে তারা টমেটো খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

৪। যাদের থাইরয়েড, কিডনিতে পাথর বা কিডনিজনিত সমস্যা আছে তারা পালংশাক এড়িয়ে চলুন। এছাড়া যাদের কিডনির সমস্যা, ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা তারা মটরশুটি কম খাবেন কিংবা এড়িয়ে যাবেন।

শীত মানেই নানা রঙের বাহারি সবজি। এসব সবজির যেমন রয়েছে বৈচিত্র্যতা তেমনি রয়েছে নানা পুষ্টিগুণ। শীতে আমাদের শরীর নানা রোগব্যাধিতে ভুগে থাকে; যেমন– ঠান্ডাজনিত সর্দি-কাশি, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, শরীরে ক্লান্তি লাগা ইত্যাদি। এসব রোগ প্রতিহত করতে খেতে হবে শীতের সবজি। তবে নিয়ম মেনে রান্নার পদ্ধতি যথাযথ হলে শীতের সবজি আরও উপকারী হয়ে উঠবে জনজীবনে। নিজের শরীর এবং রোগব্যাধি জেনে সতর্কতার সঙ্গে সবজি গ্রহণ করলে তা আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে।

লিনা আকতার: পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর

কুয়াশায় মোড়ানো শিশির জড়ানো শীত

আলম শামস

শীত পৃথিবীর সব প্রান্তেই এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতু। প্রাণ-বৈচিত্র্যের ওপর রয়েছে এর দারুণ প্রভাব। শীত কেবল প্রাণী-প্রকৃতির আচার-আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করেনি। শীত প্রাণীর চেহারা ও খাদ্যাভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে কবিতায়-সাহিত্যের নানা শাখায় শীতকে উপেক্ষা করা যায়নি। লিখিত সাহিত্যে শীত প্রবেশের অনেক আগে মানুষের গল্পে, কিংবদন্তিতে, মিথে শীতের আগমন ঘটেছে। কেবল 'শীত' শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে কবিরা শীতের প্রকাশ ঘটায় না। শীতের প্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস, খেলাধুলার মাধ্যমে জীবনের গভীর অর্থের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে। গ্রিক মিথে শীত এসেছে পৃথিবীর দেবী-দেমিতার কন্যা হারানোর শোক থেকে। বাঙালি সমাজেও শীত নিয়ে অনেক লোক-মিথ ও প্রবাদ-প্রবচন চালু আছে। এমনকি বাঙালির বিজয়, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে শীতের একটি কালিক সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে। সুতরাং বলাই যায়, শীত বাঙালির নিজস্ব ঋতু; বাঙালির উৎসবের ঋতু। বাঙালির এ শীত উৎসব প্রকৃতিরই দান।

বছর ঘুরে প্রকৃতিতে আবার এসেছে শীত। পৌষ ও মাঘ শীতের সীমারেখা হলেও এর ব্যাপ্তি তিন-চার মাসজুড়ে। শীতের আগমন, বিচরণ, অবস্থান, প্রস্থান আমরা দারুণভাবে উপভোগ করি। শীতের সাথে আমাদের সখ্যতা সৃষ্টির শুরু থেকে। প্রকৃতিই শীতের কথা বলে। শীতের আগমনে সাড়া পড়ে প্রকৃতিতে। মানবসমাজে সৃষ্টি হয় নতুন আমেজ ও উৎসব। শীত দারুণ প্রসারিত তার এক একটি বাহু। উঁচু উঁচু গাছের মাথায় তার প্রলেপ কুয়াশার বিস্তার। আমাদের বাড়ি-ঘর কুয়াশার আবরণে সকাল ৯/১০ টার আগে স্পষ্ট হয় না। গাছের পাতার হলদে রং। শোনা যাচ্ছে তাদের ঝরে পড়ার শব্দ। শুধু ভোরবেলায় গুটিকয়েক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ আর শীর্ণ দেহী, জীর্ণ পোশাকের পাতাকুড়ুনিদের সঙ্গে দেখা মিলে। ওদিকে সূর্য মামা তড়িঘড়ি টুপ করে ডুব দেয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় হু হু কাঁপন, বাতাসে শীতের গন্ধ। গরম চা আর ধোঁয়া ওঠা ভাপা পিঠা পথে পথে। বদলে যাচ্ছে অনেক কিছু। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শীত। এই শীতকে নিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রয়েছে ব্যাপক রচনা।

বাংলা কবিতায় বর্ষা আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথের দান হলে, শীত আবিষ্কারের কৃতিত্বটুকু জীবনানন্দ দাশের। সত্যিই সবটুকু 'বুকের শীত' দিয়ে বাংলা কবিতায় শীত নির্মাণ করেছেন তিনি। যদিও তার শীত পশ্চিমের আদলে গড়া, যদিও তার শীত মৃত্যুর সিম্বল, যদিও তার 'রূপসী বাংলা' মৃত্যুর পার থেকে মহাকাল দর্শন; তবু আশ্চর্যজনকভাবে 'রূপসী বাংলা'র সৌন্দর্যও শীতে। 'রূপসী বাংলা'য় পরাক্রান্ত বর্ষা পরাহত। জীবনানন্দের মানসলোকে বৃষ্টি নেই। তার রূপসী বাংলা জসীমউদ্দীনের মতো কিংবা আরো গভীরভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়

'পউষের ভেজা ভোরে' 'নোনাফল' 'আতাবন' 'পউষের শেষরাতে নিমপেঁচাটির কথা'। আবার 'শীতরাত' কবিতায় তিনি বলেন, 'এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে;/ বাইরে হয়ত শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা।' ঘুরে ঘুরে জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কবিতায় কাল নির্মাণ করেছে হেমন্ত ও শীত।

জীবনানন্দ দাশ পরবর্তী বাংলা কবিতার শীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার বৃত্তের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। তবে চল্লিশের মার্কসবাদী কবিদের কাছে শীতের এ ধরনের সিম্বল কাজ করেনি। শীত যে এদেশেও গরিব মানুষের জন্য বাড়তি ঝামেলা সে কথা কবিতায় এসেছে। সুকান্ত শীতের সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেছেন, রাস্তার পাশের অসহায় শিশুটিকে সে যেন উত্তাপ দেয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা 'কোনো এক মাকে' কবিতায় শীতের প্রকৃতি 'কুমড়ো বড়ি'র বিচ্ছেদ অঙ্কিত হয়েছে।

জীবনানন্দের পরে বাংলা কবিতায় শীত ফিরে এসেছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। বিশেষ করে তার প্রথম দিকের কবিতায় জীবনানন্দের মতো শীতের অনুষঙ্গ এসেছে ঘুরেফিরে। তাঁর 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'রূপালী স্নান' কবিতাতেই তিনি লিখেছেন, 'দুটুকরো রুটি/ না পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক গাঁ ঘুমেই বিবর্ণ হই।' কিংবা 'শান্ত রূপালী স্বর্গ শিশিরে স্নান করি আমি' আর এ গ্রন্থের 'তার শয্যার পাশে' কবিতায় 'শুয়ে আছে একজন নিরিবিলি ভোরের শয্যায়।/ শীত-গোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন/ শিথিল শরীর তার লেগে আছে ফ্যাকাশে চাঁদরে।' শামসুর রাহমানের কবিতাতেও শীত মৃত্যুময় অতিলৌকিকতার সিম্বল হয়ে এসেছে। তবে তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় মহাকালের সময় চেতনা প্রকাশিত হলেও বাক্‌প্রতিম ও আঙ্গিকে ব্যাপক ভিন্নতা এসেছে।

আল মাহমুদের কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনায় শীত তেমন তীব্র নয়। তাই বলে শীতের অনুষঙ্গ বিরল নয়। কবিতার বহু জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে শীত। যেমন লোকলোকান্তরে 'কখনো ভোরের রোদে শিশিরের রেনু মেখে পায়/ সে পুরুষ হেঁটে যায় কুয়াশায় দেহ যায় ঢেকে।'

শীতকাল আমাদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, অনুভব উপভোগ, যতটা স্বতন্ত্র, ততটা আলোচ্য বিষয় হিসেবে মূল্য পায়নি। গ্রাম্য জীবনে শীত আসে নানা মাত্রা নিয়ে। এর সঙ্গে একজন কৃষকের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা যুক্ত, কষ্টের ভেতরেও তার প্রাপ্তি আছে। ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি বা দরিদ্রক্লিষ্ঠ মানুষের জন্য সময়টা নিরানন্দময় তার অর্জনের ভাণ্ড একবারে শূন্য না হলেও চাহিদার তুলনায় প্রাপ্তি নগণ্য। যেখানে শ্রমের বিনিময়ে অর্জন কম, সেখানে ক্লেশের মূল্য কোথায়? শহরে জন্ম নেওয়া মানুষ প্রকৃতির এই রূপ আর রং পরিবর্তনকে ততটা আমলে আনেন না। কেন না তার জীবিকা কিংবা বিত্ত-বসাতির সঙ্গে বিশেষ কোনো ঋতু সরাসরি যুক্ত হয়। গাঁয়ে শিকড় রয়ে যাওয়া প্রথম প্রজন্মের শহরবাসী শীতকে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যেতে দেন না সত্যি কিন্তু কর্মব্যস্ত সময়ের ভেতর একে নিয়ে দু'দণ্ড তার ভাবার অবসর কম। অবশ্য শীতকালে গ্রামে যাওয়ার সুযোগ পেলে সেটা তারা মাঝেমধ্যে কাজে লাগান। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতেও শীত ঋতুটা যেন 'ব্রাত্যজন'। তাকে নিয়ে লেখালেখি বেশি কিছু নয়, যদিও বাংলাদেশের ছয়টি ঋতুর প্রধান তিনটির একটি শীতকাল। শীত হলো সমৃদ্ধির প্রতীক। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'শরত-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার। সেই জন্য সেখানে তাহার তিন মহল, ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী'। শরত-হেমন্ত হলো বর্ষা আর শীতের ক্রান্তিকাল। বস্তুত ওই দুই ঋতু ফসলের সমস্ত সম্ভার অবারিত-অকৃপণ হাতে শীতের কাছে পৌঁছে দেয়। সে কারণে শীতকাল, বিশেষ করে এর দিনের বেলাটি কর্ম উদ্দীপনায় মুখর। আবার বৈপরীত্য এর রাতে, নির্জনতা স্তব্ধতার কাছে সে তখন নিজেকে সম্পূর্ণ করে। অবশ্য এই চিরাচরিত চিত্রও বদলে যাচ্ছে এখন। রাতও হয়ে উঠছে কর্মময়।

শরতেই কুয়াশা পড়া শুরু হয়, হেমন্তে তা গ্রাস করে গোটা জনপদকে। সূর্য মকরক্রান্তি বরাবর অবস্থান নেওয়ার ফলে দিন ক্রমশ ছোটো হয়ে আসে। শীতার্ত উত্তুরে বাতাস ধেয়ে এসে মানুষের শরীরে যেন হুল ফোটায়। শহরের দালানকোঠার ভিড়ে শীতল হাওয়ার সঙ্গে কুয়াশার জঙ্গল একাকার হয়ে যায়। প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে গিয়ে বোঝার উপায় থাকে না এতে কতটুকু কুয়াশা আর কতটুকু কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কিন্তু শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ে পা রাখলেই যে কুয়াশা আলিঙ্গন জানায় তা বিশুদ্ধ এবং তরতাজা। শীতে মাঠ থেকে পানি নেমে যাওয়ার দিগন্ত জোড়া মাঠ গাঁয়ের মানুষের কাছে চলাচলের যোগ্য হয়, যা বর্ষায় ছিল অগম্য। খটখটে পায়ে চলা কাঁচা সড়ক ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতেও বাঁধা নেই। মানুষের চলাচলও বেড়ে যায় এ সময়। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়া-আসা ও দূর গাঁ থেকে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসা বধূর প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় এ শীত ঋতু। গাঁয়ের বাজারগুলোও জমজমাট হয়ে ওঠে। চারদিকে ইচ্ছেমতো বেড়ানোর সুযোগে গ্রামবাংলা প্রকৃতপক্ষেই শীতে উৎসবমুখর হয়ে উঠে।

বাংলা কবিতার পাশাপাশি ইংরেজি কবিতায়ও রয়েছে শীতের ছড়াছড়ি। চারশো বছর আগে *শেক্সপিয়ার* 'উইন্টার টেল' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। প্রিয়তমার সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো উপায় না পেয়ে বর্ষার মেঘের কাছে লিখেছিলেন কালিদাস। *শেক্সপিয়ারের* কালেও বাঙালি কবিরা বর্ষা নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষার অনুষঙ্গ অপরিহার্য ছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে বর্ষাকে বাদ দেওয়া যায় না। শীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম জমেনি কেন তা আমাদের অজানা রয়ে গেছে। রাখাল বালক হয়ত শীতবস্ত্রের অভাবে কুঁকড়ে থাকতেন। ধেনু চরাতে বাইরে যেতে পারতেন না। আর ধেনু চরাতে না গেলে কীভাবে দেখা পাবে গোয়ালা-দুহিতার।

মধ্যযুগের কবিতায়ও শীতের সাক্ষাৎ দুর্লভ নয়। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে নায়িকার বারো মাসের কষ্ট বর্ণনায় অনিবার্যভাবে শীত এসেছে। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়িকার বারোমাস্যা বর্ণনা করছেন ঠিক এভাবে—

পউষে প্রবল শীত সুখী যেজন।
তুলি পাড়ি আছাড়ি শীতের নিবারণ।
ফুল্লরার কত আছে কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক।

জানি না মাঘ মাসে শাক তুললে নারীর কী বিপদ হয়। তবে আবহমানকাল থেকে প্রবাদ-প্রবচনে বাঙালি জীবনের শীত উপেক্ষিত ছিল না। এদেশের সব বাঙালিই জানে 'এক মাঘে শীত যায় না'। আবার একই সঙ্গে শীতের বিপরীত তুলনার প্রবচন 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ'। পৌষ এখানে উৎসব। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের মধুরতম সম্মিলন ঘটে এই মাসে। তখন সবাই গাইতে থাকে 'পউষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে ছুটে আয়'। খেজুরের সুমিষ্ট রস ও পাটালিগুড়ের নানারকম পিঠা-পায়েসে ভরে ওঠে আবহমান গ্রামবাংলা। মৌমাছির গুঞ্জন এবং পুষ্পের সমাহার। অর্থাৎ পশ্চিমে যাকে বসন্ত বলা যায়; আমাদের এখানে তা-ই শীত। কিন্তু বাংলা কাব্য সাহিত্যে এই সত্য মেলেনি। এমনকি রবীন্দ্রনাথেও নয়। কারণ সত্যিই গ্রামবাংলা গভীরভাবে দেখেছিলেন তিনি; গল্পগুচ্ছে এবং ছিন্নপত্রে তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু শীত দেখেছিলেন পশ্চিমের চোখে। যেমন: রবীন্দ্রনাথে 'শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এলো/ গানের হাওয়া শেষ না হতে/ মনে কথা ছড়িয়ে এলোমেলো/ ভাসিয়ে দিলো শুকনো পাতার স্রোতে।' প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে শীতে পাতা ঝরে না। পাতা ঝরে শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে। শীতকে রবীন্দ্রনাথও মৃত্যু অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'শীতের প্রবেশ' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'শীত যদি তুমি মোরে দাও ডাক দাঁড়ায়ে দ্বারে/ সেই নিমেষেই যাবো নির্বাক অজানার পারে'। রবীন্দ্রনাথ শীতকে নির্মম, সব খোয়ানোর কাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরই জয়' অবশ্য ইংরেজ কবি পিবি শেলি অন্য কথা বলেন, 'ও, উইন্ড, ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড'। শেলির মতো বাঙালির বিদ্রোহী কবি নজরুলেও কিছুটা শীতের দর্শন মেলে। 'শীতের সিন্ধু' কবিতায় তিনিও শীতকে জীবনের একটি পর্যায় হিসেবে দেখেছেন 'ওগো মোর লীলা সাথী অতীত বর্ষার/ আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার।'

তবে সত্যিই বাঙালির কবি, বাংলার পল্লির কবি শীত চিনতে ভুল করেননি। আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রকৃত প্রকৃতির শীত অঙ্কন করেছেন জসীমউদ্দীন। তাঁর বিখ্যাত 'রাখাল ছেলে' কবিতার কালিক-আবহ শীতকালীন। শীতের অনন্য বাক্প্রতিম সৃষ্টি করেছেন এ কবিতায় 'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে,/ সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোগে হাসে'। কিংবা 'সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই' কিংবা 'চলতে পথে মটরশুটি জড়িয়ে দুখান পা,/ বলছে ডেকে গায়ের রাখাল একটু খেলে যা!' 'সরষে বালা নুইয়ে গলা হলদে হাওয়ার সুখে/ মোটর বোনের ঘোমটা খুলে চুম দিয়ে যায় মুখে।' শীতের পারসনিফিকেশন বাংলা কবিতায় এমন করে আর কেউ করেননি। 'কাল সে আসিবে' কবিতায় জসীমউদ্দীন শীতকে তাপসী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার বিখ্যাত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাতেও শীতের বাংলাদেশের ছবি ফুটে উঠেছে। জসীমউদ্দীনের কবিতাতেই প্রথম এবং শেষবারের মতো ধরা পড়ল শীত বাংলাদেশের নিজস্ব ঋতু। পশ্চিমের মতো এই ঋতুতে এদেশে গাছে গাছে তুষার ধরে না। বরফে ভূমি আচ্ছাদিত থাকে না। বরং ভূমিতে জেগে ওঠে সরিষা ফুল, নানারকম তেল ও ডাল বীজ এবং সুস্বাদু ফল। শীতকালে এদেশের প্রকৃতিকে নববধূর মতো নতুন করে চিনতে হয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমে যা বসন্ত, আমাদের তা-ই শীত। যে কারণে জসীমউদ্দীন বাংলা শীতের বাংলা। সুতরাং শীত বাঙালির ঋতু নয়– এ কথা ঠিক না। বর্ষা পরাক্রমতার ঋতু হলে, শীত সৌন্দর্যের।

বাংলাদেশে যে সবজি উৎপাদিত হয় তার শতাংশ মেলে শীতকালে। হাটবাজারগুলোতে এখন শীতকালীন শাকসবজিতে ভরপুর। সিম, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, লালশাক, পালংশাক, টমেটো ইত্যাদি। গ্রামীণ হাটে বসেছে সবুজের মেলা। শীতে গ্রামীণ বধূরাও বসে নেই। শীতের পিঠে-পায়েস তৈরির ধুম পড়েছে তাদের মধ্যে। ধানভানা আতপ চাউল তৈরি করা, ঢেঁকিতে কিংবা মেশিনে চাউলের গুঁড়া বানানো ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত কৃষানিরা। আবহাওয়ার পরিবর্তন হেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা প্রতিবছরই বেশি অনুভব হয়। রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধাসহ উত্তরাঞ্চলের অনেক জেলায় রাতের তাপমাত্রা বেশ হ্রাস পায়। ফলে সেখানে হাড় কাঁপানো শীতের হাত থেকে বাঁচার প্রস্তুতিও বিচিত্র।

শীত উৎসব এবং এর আহার্যের সঙ্গে খেজুর রসের সম্পর্ক নিবিড়। একেবারে জলাভূমি ছাড়া এবং কিছু পাহাড়ি ভূমি বাদে এর বাংলাদেশে এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে খেজুর গাছ জন্মে না। তবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খেজুর গুড় উৎপাদিত হয় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। বিস্তর মজুর যুক্ত হন খেজুর গাছ কাটা, রস সংগ্রহ, তা জ্বাল দেয়া ও গুড় তৈরির কাজে। যে-কোনো চাষিই খেজুর গাছে কাটতে পারেন রস আহরণের জন্য কিন্তু এক্ষেত্রেও আছে কিছু কৌশল। যা শিখতে সময় নেই, তাই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল ধরে পেশাদার গাছ কাটিয়ে আছে। স্থানীয় ভাষায় এদের বলা হয় গাছি। কার্তিক মাসের শুরু থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত এরা খেজুর গাছ কাটায় নিয়োজিত থাকেন। যে সব চাষির স্বল্প সংখ্যক খেজুর গাছ আছে তারা নিজেরাই তা কাটেন, রস পাড়েন এবং বাড়িতে এসে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির কাজও সেরে নেন।

শীতের প্রকোপ যত বেশি পড়ে, রসও হয় তত বেশি। তাই শীতকালে খেজুর গাছ আছে এমন অঞ্চলে গেলে দেখা যায় তীব্র শীতের মধ্যেও রাতের পরিবেশে একটা পার্থক্য আছে। সকালে গাছ থেকে রস পাড়ার পর তা জ্বালিয়ে শেষ করা হয়ে যায় দুপুরের মধ্যে। এ হলো 'জিরান কাট' রস, স্বাদে এবং গন্ধে সবচেয়ে উত্তম। 'জিরান কাট' রস নামানোর পর আবারও রসের ভাড় বা কলস গাছে টাঙানো হয়, এ থেকে যে রস পাওয়া যায় তা উলাকাটা। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন গভীর রাতে রস জ্বালানো উনুনের আগুন খেজুর বনের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে, বহু দূর থেকে বোঝা যায় ওখানে স্তব্ধতার মধ্যেও জীবনের স্পন্দন আছে। উনুনের পাশে থাকে গাছি আর মজুরদের থাকার জন্য বানানো কুঁড়েঘর, খেজুরের পাতা কিংবা বিচালি দিয়ে ছাওয়া। গাছিয়া নিঃসঙ্গতা কাটাতে গ্রাম এলাকায় চালু নানা ধরনের 'দেহতত্ত্ব' গান গেয়ে চলেছেন। লালন, পাগলা কানাই কিংবা নাম না জানা গ্রাম্য পদকর্তার এসব পদ বিকৃত হয়েছে স্থানীয় উচ্চারণে কিংবা যুগ থেকে যুগে মুখে মুখে গীত হবার কারণে। কিন্তু সুরে আছে অদ্ভুত প্রাণময়তা ও আবেগ যা সহজেই হৃদয়ে ছুঁয়ে যায়। যে গাছি কয়েক মাসের জন্য দূর গাঁ থেকে এসেছেন, ঘরে যার আছে 'বালিকা বধূ' তিনি দেহতত্ত্ব গান না গেয়ে পুরানো যাত্রাপালা কিংবা লোকগীতির সেই সংগীতগুলো উচ্চারণ করেন, যাতে আছে বিরহ মেশানো। নৈঃশব্দ্য নিঃসঙ্গতা এবং বিরহ পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত হাওয়ায়, প্রাণের গভীর থেকে উঠে আসা ওই সংগীত শীতের অনঢ় বৃক্ষগুলোও যেন কেঁদে ফেলে। এই শীতে খেজুর গাছিদের অন্যতম বিনোদন হলো রেডিও। তারা রেডিওতে অন্যের গান শোনেন, কিন্তু নিঃসঙ্গতা ভুলতে স্বকণ্ঠের সংগীতের কোনো বিকল্প আছে কি না তা জানা নেই। গাছিদের জীবনের সুখ-দুঃখের বিরহ গাঁথাও হারিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক জীবন ও তার হিসাব-নিকাশের আড়ালে।

শীত তার বিচিত্র রূপ ও রস নিয়ে হাজির হয় গ্রামবাংলায়। নবান্ন উৎসব কিংবা শীতের পিঠা-পায়েস তৈরি উৎসব এখন তেমন ঘটা করে হয় না। তারপরেও শীতের যা কিছু চিরায়ত রূপ তা উপলব্ধি করতে হলে গ্রামে যেতে হবে। গাঁয়ের মেঠোপথের দু'ধারে দুর্বাঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুর উপর শীতের সূর্যের সোনালি রোদ পড়লে অর্পূব দৃশ্যের অবতারণা হয়। গ্রামবাংলায় শীত আসে ফসলের সম্ভারের সঙ্গে যেমন সমৃদ্ধি আনে তেমনি পাশাপাশি আনে প্রকৃতিতে অসীম শূন্যতা। ফসলবিহীন আমন জমি পড়ে থাকে এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে। ঝরা পাতাকে বিদায় জানায় পত্রমোচী বৃক্ষ, সেখানেও তার অব্যক্ত বেদনা যেন মূর্ত হয় সংগোপনে, যা শুধুমাত্র অনুভবের বিষয়।

শীতের নির্জনতার মধ্যে নীরব অস্তিত্বের প্রকাশও সৌন্দর্যমণ্ডিত। প্রতিটি ঋতুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শীতের কর্মব্যস্ত দিনের সমস্ত কোলাহলকে আড়ালে করে যখন রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়, তখনই খুঁজে পাওয়া যায় শীতের আসল রূপটি। এই রূপ তার নিজের চোখ দিয়ে হৃদয় দিয়ে একে অনুভবের ব্যাপার।

শীত আসে শীত যায় ডুবিয়ে কুয়াশায়। নগরজীবনে এ সময় ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়। নতুন নতুন মেলা উৎসব ছড়িয়ে পড়ে পাড়া মহল্লায়। বাজারে ভিড় বাড়ে, বদলে যায় দিনের হিসাব। নতুন ফ্যাশনের সাজ পোশাক কেনাকাটা বেড়ে যায়। শীতের তীব্রতা জীর্ণ কুঠিরে অনাহারী প্রাণ হারায়। আমরা এমন শীতের স্বপ্ন দেখব যে শীতের উত্তাপে সকলে মিলেমিশে থাকব দুধেভাতে।

শীতে বাংলাদেশের প্রকৃতির সাজ রব আর উৎপাদিত শস্য এদেশের মানুষকে উৎসবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই বাংলা কবিতায় শীতও এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিহার্যভাবে নানা আঙ্গিকে। শীতের মিঠেরোদ, শীতের পাটালিগুড়ের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ুক বাংলা কবিতায়। আর সঙ্গে পথের ধারের শীতার্ত শিশুটি পাক কবিদের বুকের অবাধ উষ্ণতা।

আলম শামসঃ কবি ও সাংবাদিক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, dhaka786@gmail.com

বাংলাদেশের তারুণ্যের শক্তি উন্নয়নের বাতিঘর

খান চমন-ই-এলাহি

তরুণ শক্তি ও তরুণ সমাজের কোনো বিকল্প নেই। তরুণ-তরুণীরা দেশ, জাতি ও বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ শ্রেণি বা তরুণ সমাজের ঐক্য ও উন্নয়ন দর্শন ছাড়া কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় বা কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষের গালগল্পে ভাগ্য পরিবর্তন হবে না।

যুবমানস গঠন করা আবশ্যক। মানসিক উৎকর্ষে পৌঁছলে সভ্যতার সারথি হওয়া যায়। আর উৎকর্ষের জন্য তরুণদের নিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বিশ্ব ব্যবস্থাকে ভাবতে হবে।

তরুণদের দেশ ও জাতি গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সৎ ও সুন্দর জীবন ও জগৎ গড়ার প্রত্যয় সৃষ্টি করতে হবে। এমনটি সম্ভব হলে পার্থিব ও অপার্থিব সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কোরানে সুরা কাহাফে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'নাহনু নাকুচ্ছসু আলাইকা নাবাআহুম বিলহাক্কি, ইন্নাহুম ফিতইয়াতুন আ-মানূ বিরাব্বিহিম আ-মনূ বিরাব্বিহিম ওয়া যিদনাহুম হুদা'– যার অর্থ, 'আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।' যুবকরা যখন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় তখন কল্যাণ ও মঙ্গল নেমে আসে। বিভিন্ন সময় এ সত্যের উন্মোচন হতে দেখি।

তরুণ-তরুণীর ঐক্য, সংহতি নতুন এক জীবনের সন্ধান দেয়। তারুণ্যের আলোয় উদ্ভাসিত তরুণ-তরুণীরা মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। যে পথে চললে দেশ ও জাতির কল্যাণ হয়। এমনকি বিশ্ব ব্যবস্থায় নিজ দেশের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটায়। গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক মুক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহ-অবস্থান, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'- এ জ্ঞানের বিকাশে ভূমিকা রাখে তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর রাস্তায় তুলে দিয়ে অগ্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তরুণরা। কিন্তু বার বার তরুণরা উপেক্ষিত। শিক্ষিত কর্মক্ষম তরুণের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন হয় না বলে আমরা পিছিয়ে পড়ি।

বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বা অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় উপলব্ধি করছে তারুণ্যের জোয়ারকে কাজে লাগাতে না পারলে বাংলাদেশের প্রকৃত অগ্রযাত্রায় গতি আসবে না। সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। দেশের ভেতরে-বাইরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। যা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। বিবিধ বাধা সত্ত্বেও তরুণরা এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীর সংখ্যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ থেকে এগিয়ে। বিস্ময়করভাবে তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবিশ্বাস্য-অপ্রতিরোধ্য গতিতে তারুণ্যের শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে, হচ্ছে। আগামীর পৃথিবী হবে বাংলাদেশের। যদি জাতি হিসেবে তারুণ্যের এই জেগে ওঠা শক্তিকে উন্নয়নের সড়কে ধরে রাখা যায় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। যদিও ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীর সংখ্যা সময়ের হিসেবে বাড়ে না। তবে জ্যামিতিক রীতি, জন্মহার ও চিকিৎসার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান যুব শ্রেণির জন্য আশীর্বাদ হলো– এ বিপুল যুব জনসংখ্যা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ হিসেবে দরজায় কড়া নাড়ছে। একে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ কর্মক্ষম তরুণরা কবিদের চোখও এড়ায় না। কারণ তরুণরা জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ইসলামের কবিতার মতো সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণের গান শোনায়। এখানে যথার্থভাবে উচ্চারণ করা যায় 'যৌবন-জল-তরঙ্গ' কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা। নজরুল তরুণদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন–

যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—

ওরা দিক গালি, মোরা হাসি খালি বলিব 'ইন্না...রাজিউন'।

এখানে তারুণ্য সেই শক্তির জয়গান করে যে শক্তি মানসিকভাবে ভীত, বৃদ্ধ, দুর্বল নয়। বৃদ্ধ একটি মনের ব্যাপার। আমাদের তারুণ্যকে কেন প্রাধান্য দিতে হবে তা আরো অগ্রসর হলে বুঝা যাবে। তরুণরা মহাশ্মশানকেও সজীব করে, প্রাণসঞ্চার করে, আশার আলো জ্বালায়। বাংলাদেশের মানুষ নদীর জোয়ার-ভাটার মতো বহু সংগ্রাম দেখেছে। যুব শ্রেণির এগিয়ে আসা দেখেছে। তারা যুবকদের নিয়ে ভাবতে শিখেছে। জাতীয় কবি নজরুলের নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিমালায় উল্লেখ করেন–

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব কবির মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল!

তরুণরা জাতির ভবিষ্যৎ। তাই তরুণদের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থ ও কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকের বাণী রয়েছে। এ সকল বাণীর সারকথা হলো, তারুণ্যই শক্তি, তারুণ্যই বল, তারুণ্যই পারে সকল প্রকার কুসংস্কারের প্রাচীর ভাঙতে। সংস্কার তরুণদের হাতেই সম্ভব। আর সম্ভব বলেই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন–

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

আমরা তারুণ্যের শক্তিকে নানাভাবে পাই বলেই কবি ঋষিগণও তারুণ্যের বন্দনা করেছেন। সমাজের নপুংশকদেরও কুসংস্কার নিয়ে জড়িয়ে থাকা মানুষ থেকে মুক্তির গান বাঙালির হৃদয়ে সবসময় ছিল। তবে মাঝেমধ্যে পথ হারিয়েছে।

বাংলাদেশে তারুণ্যের যে জোয়ার তা যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে। বর্তমানে ৬৪% যুব শ্রেণির অংশ। সদ্য তারুণ্যের জয়গান গায় প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। শুধু মুখে মুখে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বললে মাথাপিছু আয় বাড়বে না, সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না। প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াসের। বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র সেই মহান কাজটি করছে যা তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগাবে। তারুণ্যের এই মহাশক্তির কোনোই বিকল্প নেই। এখন সময় লাল-সবুজের পতাকা এগিয়ে নেওয়ার, এখন সময় তারুণ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্থবহ করার। জাতির চোখ এখন সেই মহাকল্যাণের দিকে। কিন্তু মহাকল্যাণ কারো কাছে আকাশ থেকে পড়ে না, নদীর জোয়ারে ভেসে ভেসে আসবে না, বাতাসে অক্সিজেনের মতো ঢুকবে না, এজন্য প্রয়োজন নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ। যুব শ্রেণির জন্য উপযোগী করে পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। প্রচার চালাতে হবে যুবকদের কাজে লাগাবার জন্য। সেক্টর নির্ধারণ করতে হবে। কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি, মৎস্য, গার্মেন্টস, আবাসন পশুপাখি পালনসহ বিভিন্ন সেক্টর নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে। বিদেশে গিয়ে যাতে রেমিটেন্স পাঠাতে পারে, দেশের জন্য তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

তরুণদের জন্য এখন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা দরকার। দেশে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ সরাসরি তরুণ-তরুণী। এদের বার্ধক্যে আসার আগেই কাজে লাগাতে হবে। এদের বেকার ভাবার কোনো সুযোগ নেই। এরা কর্মপ্রত্যাশী, কর্মের সংস্থান হলে দেশ

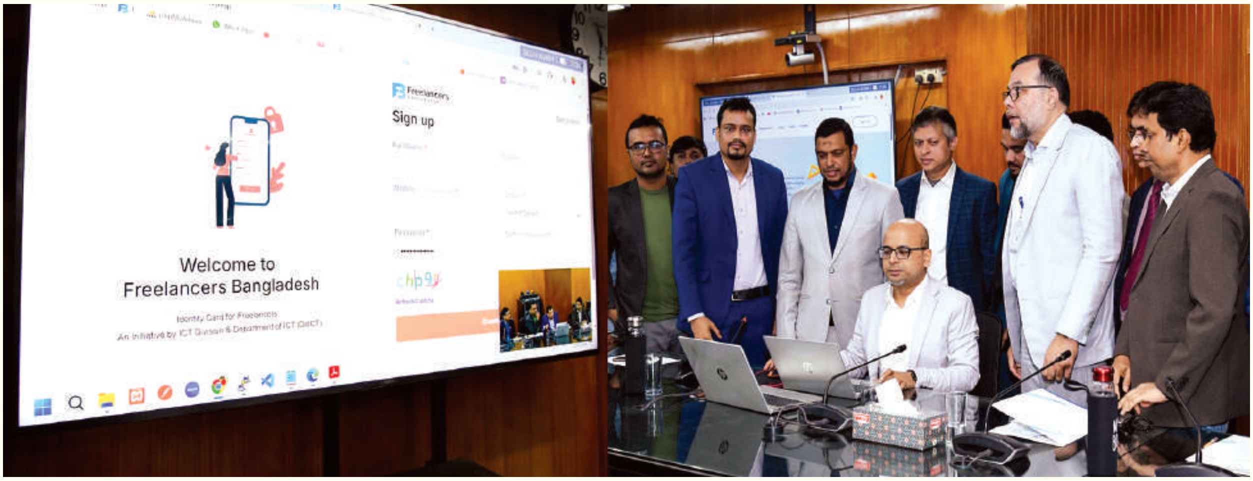

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ১৩ই জানুয়ারি ২০২৬ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে ফ্রিল্যান্সিং কার্যক্রম অধিকতর প্রসারের লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন– পিআইডি

ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। চাকরি চাকরি করে সময় নষ্ট না করে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণের বিপরীতে অর্জিত শিক্ষণ যাতে কাজে লাগে তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোনোরকম প্রশাসনিক জটিলতা যাতে তৈরি না হয়, বাজেট সৃষ্টি না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে আন্তরিকতার সাথে দেশপ্রেমমূলক মনোভাবে এগিয়ে আসে তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বা যৌথ উদ্যোগে সবকিছু করতে হবে। জ্ঞানগত ও বস্তুগত সহায়তা সহজলভ্য করতে হবে। অবহেলা অনিয়ম থাকবে না কিংবা চলবে না। উৎপাদন ও বিপণনে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। আইনের চোখে সবাই সমান এ নীতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। একটি ভালো উদ্যোগ যাতে আলোর মুখ দেখে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সীমা সম্পর্কে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। মাটি ও মানুষের স্বার্থে অনেক কাজ করা যায়। অনেক কাজের মধ্যে এগুলোও করা যায়। এতে তরুণরা উপকৃত হবে। মাদকতা, নেশা, চাঁদাবাজি, অন্যায়মূলক কাজ থেকে বেরিয়ে আসবে। কাজ মানুষকে অসৎ

একগুচ্ছ ফ্রিল্যান্সার

(ছবি-ইন্টারনেট)

কর্ম থেকে, অন্যায়মূলক কাজ থেকে বিরত রাখে। হ্যাঁ, অনেক কাজের মধ্যে যে কাজ করা যায় তা হলো, উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ। কারিগরি প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, শিল্প একাডেমির সাথে সংযোগ সাধন ভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে কাজে দ্রুত মনোযোগ দিতে পারে।

তরুণদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিংয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছাতে পারে সে মেধা তারুণ্যনির্ভর শক্তির মধ্যে আছে। শুধু দরকার পরিবেশ সৃষ্টি। বিশ্ব বাজারে কীভাবে ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুবিধা কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে এবং দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ইন্টারনেট সহজলভ্য করতে হবে। যুগপৎ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। স্টার্টআপ ও উদ্ভাবন হাব কাজে লাগাতে হবে। যুবকদের জন্য স্ট্যার্টআপগুলোকে নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নে মেন্টারশিপ, অফিস স্পেস এবং মূলধন দিয়ে সহায়তা করতে হবে। নারী কর্মসংস্থানের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। নারী উদ্যোক্তাকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মৎস্য ও পশু পালনকে উৎসাহিত করতে হবে। তৃণমূলে সরকারের বিভিন্ন অফিস রয়েছে, এ সকল অফিসকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। পোশাকশিল্পে তরুণ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। ওষুধশিল্প বিকাশে তরুণদের আরো সম্পৃক্ত করতে হবে। স্বাস্থ্য ও ওষুধশিল্প খাতে তরুণদের উপস্থিতি আশানুরূপ নয়। সুতরাং তরুণদের উপস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।

আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ধ্যান-জ্ঞান এগিয়ে যাওয়া। পৃথিবীর মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা চির অম্লান থাকবে সেই চাওয়া। শাশ্বত বাংলাদেশ আমাদের হৃদয়ের গভীর গোপন থেকে নতুন অনুপ্রেরণা জোগায়। এজন্য আমরা যেখানে যাই সেখানেই বাংলাদেশ অনুভব করি।

এই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। অর্থনীতিতে আমরা বহু দূর এগিয়ে গিয়েছি কিন্তু তা শতভাগ অর্জন করতে পারেনি। এখন সুষম উন্নয়ন নীতির আলোকে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। বর্তমানে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ তরুণ-তরুণী; যারা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে পৃথিবীতে বিস্ময়পূর্ণ করতে পারে। সরকারও অনেক ভালো ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং করবে। নিশ্চয়ই তরুণ শক্তির বিকল্প নেই। আর তরুণ শ্রেণিই সূর্য সন্তান হয়ে দেশকে আলোর পথ দেখায়। তরুণ শ্রেণিই উন্নয়নের বাতিঘর। পরিচর্যা পেলে নোঙর করবে বিশ্ব দরবারে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হবে তাৎপর্যমণ্ডিত।

খান চমন-ই-এলাহি: কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার ও অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

দ্বিতীয় ধাপে ৮ জেলায় ই-বেইলবন্ড উদ্বোধন

বিচার ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ধাপে একযোগে ৮টি জেলায় ই-বেইলবন্ড সেবা উদ্বোধন করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। ২১শে জানুয়ারি সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভার্চুয়ালি তিনি এ সেবার উদ্বোধন করেন।

মানিকগঞ্জ, বান্দরবান, মেহেরপুর, জয়পুরহাট, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, ঝালকাঠি ও শেরপুর জেলায় এ সেবা চালু করা হয়। এর আগে নারায়ণগঞ্জ জেলায় ই-বেইলবন্ড সেবা চালু করা হয়। নারায়ণগঞ্জে এর কার্যক্রম সফলভাবে চলমান থাকায় নতুন করে আরও ৮টি জেলায় এ সেবা সম্প্রসারণ করা হলো। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ধাপে ধাপে দেশের ৬৪টি জেলায় ই-বেইলবন্ড সেবা চালু করা হবে। ই-বেইলবন্ড চালুর ফলে একজন বন্দিকে খুব দ্রুত মুক্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অনলাইনে বেইলবন্ড দাখিলের মাধ্যমে এক ঘণ্টার মধ্যেই একজন আসামিকে মুক্তি দেওয়া যাচ্ছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, আগে জামিন পেতে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হতো, এতে সময় ও অর্থ ব্যয় হতো এবং ভোগান্তি বাড়ত। অনেক ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত সময় লাগত। অনলাইনে এ প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় কে, কখন স্বাক্ষর করলেন-তার পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে এ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার সুযোগ থাকবে না।

এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলায় সফলভাবে চালুর পর আরও ৮টি জেলায় এ সেবা চালু হওয়ায় এখন এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমাদের হাতে আরও কিছু সময় রয়েছে, এ সময়ের মধ্যেই আমরা আরও কয়েকটি জেলায় এ সেবা চালু করার চেষ্টা করব। আমরা আশা করছি আগামী ছয় মাসের মধ্যেই দেশের সব ৬৪টি জেলায় ই-বেইলবন্ড চালু হবে।

পরবর্তী সরকার ই-বেইলবন্ড ব্যবস্থা চালু রাখবে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি একটি অত্যাবশ্যক (Essential) সেবা। পরবর্তী যে সরকারই আসুক, তারা এ ব্যবস্থায় বাধা দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। এ যুগান্তকারী পদক্ষেপ বিচারপ্রার্থী, কারা প্রশাসন ও আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ে সহায়ক হবে বলে উপদেষ্টা মত প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন

গোলাম সাকলায়েন

বাংলাদেশ– একটি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ দেশ। আমাদের সময়ের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম জনসংখ্যা বৃদ্ধি। প্রায় ১৮ কোটি মানুষের জনসংখ্যার এই দেশ- যেটি আয়তনে ছোটো; সম্পদ, অবকাঠামো এবং সামাজিক সেবার ওপর রয়েছে সুস্পষ্ট চাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি জটিল সমস্যা– যা নিরক্ষরতা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে, বহুবিবাহ এবং বিনোদনমূলক সুবিধার অভাবের মতো বিভিন্ন কারণে ঘটে। এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণের পরিণাম সুদূরপ্রসারী, যা বাংলাদেশের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে– অর্থনীতি থেকে পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য থেকে সামাজিক স্থিতিশীলতা পর্যন্ত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

শিক্ষার ভূমিকা: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হলো নিরক্ষরতা। বিশেষ করে নারীদের জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ সীমিত থাকায় অনেকেই পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি বা বড়ো পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি সম্পর্কে জানেন না। শিক্ষা শুধু সাক্ষরতা নয়, বরং ব্যক্তির জ্ঞান- যাতে তারা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেখানে শিক্ষার হার কম, সেখানে জন্মহার বেশি থাকে। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে যেখানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে জন্মহার কমেছে। বিশেষ করে নারীদের লক্ষ্য করে শিক্ষামূলক উদ্যোগগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে সফল হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা এবং মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানোর উপর ফোকাস করে প্রোগ্রামগুলো পরিবারের আকার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু

জলবায়ু এবং উর্বরতার হার: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। কৃষি সমাজে শিশুদের প্রায়ই অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখা হয়, কারণ তারা কৃষি কাজ এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজে সাহায্য করে। উষ্ণ জলবায়ু সারাবছর ধরে চাষাবাদ সমর্থন করে, যা বৃহত্তর পরিবারের জন্ম দেয়। উচ্চ উর্বরতার হার আংশিকভাবে সাংস্কৃতিক নিয়মের কারণে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে বড়ো পরিবারকে মূল্য দেওয়া হয়, কারণ শিশুদের পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হয়।

সম্পদের ওপর প্রভাব: গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু কৃষির জন্য সুবিধাজনক হলেও, এটি সম্পদের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে। এটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বৃহত্তর পরিবারকে সমর্থন করা খাদ্য, পানি এবং বাসস্থানের ওপর চাপ বাড়ায়।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে

সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং আইনি চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশের অনেক অংশে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে একটি গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রথা। এই প্রথা কেবল তরুণ মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণকে প্রভাবিত করে না, এটি দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চক্রকে আরও ঘনীভূত করে তোলে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব: অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে মেয়েদের শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সীমিত করে, যা তাদের বড়ো পরিবার গঠনের প্রবণতা বাড়ায়, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এই প্রথা একটি চক্র সৃষ্টি করে যেখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে বৃহত্তর পরিবারের জন্ম দেয়, যা দারিদ্র্যের চক্রকে আরও ঘনীভূত করে।

বহুবিবাহ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব: যদিও কম প্রচলিত তবে বাংলাদেশের কিছু অংশে বহুবিবাহ এখনো প্রচলিত আছে, যা বৃহত্তর পরিবারের সৃষ্টি করে। বহুবিবাহের পুরুষদের সাধারণত বেশি সন্তান থাকে, যা সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সামগ্রিক জনসংখ্যা বাড়ায়।

সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ: বহুবিবাহ কমাতে প্রচেষ্টাগুলো, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ঐতিহ্যবাহী প্রথাগুলো গভীরভাবে শিকড় গেঁড়েছে, সেখানে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। তবে, জনসচেতনতা প্রচারণা এবং আইনগত সংস্কার বহুবিবাহের প্রভাব হ্রাস করতে সহায়ক হতে পারে।

বিনোদনমূলক সুবিধার অভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক: বাংলাদেশের অনেক অংশে বিনোদনমূলক সুবিধার অভাব এবং বিকল্প ক্রিয়াকলাপের কারণে লোকেরা প্রায়ই ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক জীবনের দিকে

মনোনিবেশ করে। বিনোদনের সুযোগ সীমিত হওয়ায় সামাজিকীকরণ প্রায়শই পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, বৃহত্তর পরিবারের আকার একটি উদ্দেশ্য এবং ব্যস্ততার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

শহর বনাম গ্রামীণ গতিশীলতা: শহরাঞ্চলে যেখানে বিনোদনমূলক সুবিধাগুলো বেশি উপলব্ধ, সেখানে জন্মহার তুলনামূলকভাবে কম। এটি ইঙ্গিত দেয় যে- গ্রামীণ এলাকায় বিনোদনমূলক সুবিধার অ্যাক্সেস উন্নত করা জন্মহার কমাতে সহায়ক হতে পারে।

অর্থনৈতিক চাপ

বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য: জনসংখ্যা বৃদ্ধি সরাসরি বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের শ্রম বাজার ক্রমবর্ধমান চাকরিপ্রার্থীদের শোষণ করতে অক্ষম, ফলে বেকারত্বের হার বেশি। প্রতিযোগিতা বাড়ায় দারিদ্র্যের স্থিতাবস্থা বাড়ে, কারণ সীমিত সম্পদের জন্য আরও বেশি মানুষ প্রতিযোগিতা করে।

খাদ্য এবং আশ্রয়ের অভাব: জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ কৃষি খাত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খোরাক দিতে সংগ্রাম করে। এছাড়া, শহরাঞ্চলে পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাবে বস্তি এবং অমানবিক জীবনযাপনের প্রভাবে আবাসন সংকটও দেখা দেয়।

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার চ্যালেঞ্জ

জনস্বাস্থ্য সংকট: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রচণ্ড চাপে রয়েছে। ওভারক্রাউডেড হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলো পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়াও, জনবহুল এলাকায় রোগ সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এই চাহিদাপূরণ করতে সংগ্রাম করছে।

শিক্ষাব্যবস্থার চাপ: শিক্ষাব্যবস্থাও একইভাবে চাপের মধ্যে রয়েছে, যেখানে ওভারক্রাউডেড ক্লাসরুম এবং পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার গুণগত মান কমে যাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার ফলাফল হ্রাস পাচ্ছে- যা দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চক্রকে আরও ঘনীভূত করে।

পরিবেশগত অবক্ষয়

বন উজাড় এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস: জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন উজাড়কে ত্বরান্বিত করে– কারণ কৃষি এবং বাসস্থানের জন্য বেশি জমি পরিষ্কার করা হয়। এর ফলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায় এবং পরিবেশগত অবক্ষয় ঘটে। প্রাকৃতিক বাসস্থান ধ্বংসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে, যা চলমান এবং বায়ু দূষণ থেকে শুরু করে পরিবেশগত প্রভাবের ওপর প্রভাব ফেলে।

দূষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দূষণ সমস্যা আরও বেড়ে যায়, যেমন প্লাস্টিকের বর্জ্য থেকে শুরু করে স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত। সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা দ্বারা উৎপাদিত বর্জ্য পরিচালনা করতে সংগ্রাম করছে, যা পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের সংকট সৃষ্টি করছে।

সামাজিক অস্থিরতা

সম্পদের জন্য সংঘর্ষ: জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদের জন্য সংঘর্ষের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে জনবহুল শহরাঞ্চলে। সীমিত সম্পদের জন্য– যেমন পানি, খাদ্য এবং আশ্রয়, আরও বেশি মানুষ প্রতিযোগিতা করার ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অবকাঠামোর ওপর চাপ: বাংলাদেশের অবকাঠামো বর্তমানে জনসংখ্যার চাপ সামলাতে সক্ষম নয়, ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত থাকাটা দূরের কথা। ওভারক্রাউডেড রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থা এবং ব্যর্থ ইউটিলিটিগুলো এমন একটি দেশের লক্ষণ, যা তার জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সংগ্রাম করছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমাধান

নারী শিক্ষায় গুরুত্ব: জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে একটি হলো শিক্ষা– বিশেষ করে নারীদের জন্য। শিক্ষিত নারীরা সাধারণত কম সন্তান ধারণ করেন এবং তারা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার অ্যাক্সেস বাড়ানো জন্মহার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জনসচেতনতা প্রচারণা: জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণতি এবং পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে জনসচেতনতা প্রচারণার প্রয়োজন। এই প্রচারণাগুলো সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল হওয়া উচিত এবং জনসংখ্যার সকল অংশকে লক্ষ করে তৈরি করা উচিত।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন কার্যকর করা

আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা: সরকারকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে। এর মধ্যে কেবল আইন প্রণয়ন নয়, বরং স্থানীয় স্তরে এই আইনের প্রয়োগ এবং সম্মান নিশ্চিত করাও অন্তর্ভুক্ত।

কমিউনিটির সম্পৃক্ততা: অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোকে সম্পৃক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যবাহী নেতারা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই প্রথাগুলো সম্পর্কিত মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

পরিবার পরিকল্পনা প্রচার

পরিবার পরিকল্পনা সেবা সহজলভ্য করা: পরিবার পরিকল্পনা সেবা আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করা জরুরি। এর মধ্যে গর্ভনিরোধক সরবরাহ, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত। পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত করা উচিত, বিশেষ করে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উপর ফোকাস রেখে।

পরিবার পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা: পরিবার পরিকল্পনা প্রোগ্রামগুলো সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল হওয়া উচিত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর জন্য ডিজাইন

করা উচিত। এর মধ্যে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের বোঝাপড়া এবং সেগুলোর প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত।

বিনোদনমূলক সুবিধা সম্প্রসারণ

অবকাঠামোতে বিনিয়োগ: সরকার এবং বেসরকারি খাতের উচিত গ্রামীণ এলাকায় বিনোদনমূলক সুবিধাগুলোতে বিনিয়োগ করা। এর মধ্যে পার্ক, ক্রীড়া সুবিধা এবং কমিউনিটি সেন্টার তৈরি অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক জীবনের বিকল্প প্রদান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস এবং জীবনের মান উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে।

যুবসমাজকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা: যুবসমাজকে বিনোদনমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত, যা তাদের দৃষ্টি অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে এবং বড়ো পরিবারের দিক থেকে সরিয়ে নিতে সহায়ক হতে পারে। এর মধ্যে খেলাধুলা, শিল্প এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ প্রচার করা অন্তর্ভুক্ত, যা পরিবার জীবনের বাইরে উদ্দেশ্য এবং ব্যস্ততা প্রদান করে।

সরকারি উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি: বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এটি মোকাবিলায় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই নীতিগুলো শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত করা উচিত, যাতে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়।

আন্তর্জাতিক সহায়তা: জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সহায়তা থেকে উপকৃত হতে পারে। এর মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলন শেয়ার করা, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং জনস্বাস্থ্য উদ্যোগগুলোতে সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি জটিল সমস্যা, যার গভীরে নিহিত কারণ এবং সুদূরপ্রসারী পরিণতি রয়েছে। এটি মোকাবিলা করতে একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন– যার মধ্যে শিক্ষা উন্নয়ন, অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ে এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন কার্যকর করা, পরিবার পরিকল্পনা প্রচার এবং বিনোদনমূলক সুবিধার সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত। সরকার ইতোমধ্যেই এই সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নিয়েছে, তবে আরও কিছু করা প্রয়োজন। একসঙ্গে কাজ করে সরকার, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে। এই সমাধানগুলো শুধুমাত্র নীতিগত পরিবর্তন নয়, সাংস্কৃতিক মনোভাব এবং প্রথাগুলোতেও পরিবর্তনের প্রয়োজন। ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এমন একটি ভবিষ্যৎ তৈরি করা সম্ভব যেখানে জনসংখ্যা সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যা সকল নাগরিকের জন্য উন্নত জীবনমান এবং টেকসই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। চ্যালেঞ্জটি বড়ো, তবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, বাংলাদেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারে এবং আরও সমৃদ্ধ এবং স্থিতিশীল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

গোলাম সাকলায়েন: প্রাবন্ধিক

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কুইক রেসপন্স টিম কার্যক্রমের উদ্বোধন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কুইক রেসপন্স টিম (Quick Response Team-QRT) কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এই কুইক রেসপন্স টিমের (QRT) মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেবা দান করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। ১৭ই জানুয়ারি ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গণভোট ২০২৬ এ সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ কেন্দ্রিক সারা দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমন্বিত সেবা জোরদারকরণ এবং কুইক রেসপন্স টিমের (QRT) কার্যক্রম'– এর সূচনা উপলক্ষ্যে 'পাশে আছি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন।

দেশের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় এই কার্যক্রম পৌঁছে দেওয়া হবে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রয়োজনে আমরা আমাদের প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায় যেন একটি নারীকেও অপমান করতে না দেই, একটি শিশুর ওপর নির্যাতন করতে না দেই। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি গ্রামকে দেখে রাখবে আমাদের এই অসাধারণ তরুণ সমাজ। এজন্য সরকার ৩০৯.৩৯ কোটি (জিওবি) টাকা ব্যয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমন্বিত সেবা জোরদারকরণ এবং কুইক রেসপন্স টিম কার্যক্রমের সূচনা করতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রতিকার ও প্রতিরোধ, সমন্বিত সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং কুইক রেসপন্স টিমের কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রুত সারভাইভারকে প্রয়োজনীয় জরুরি সেবাসমূহ নিশ্চিত করা হবে।

উপদেষ্টা আরো বলেন, এই মন্ত্রণালয় ১৪টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ৬৭টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে টোল ফ্রি জাতীয় হেল্পলাইন সেন্টার-১০৯, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ৮টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি, ৮টি বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি এবং রিয়াল টাইম মনিটরিং ডেটাবেইজের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কাজ করছে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

শীতকালে বয়স্ক ও শিশুদের যত্ন

ডা. তানজিদা রহমান

শীতকাল মানেই ঠান্ডা বাতাস সাথে কুয়াশার প্রকৃতি। গরমের চেয়ে শীতকাল আরামদায়ক হলেও শীতের তীব্রতা বয়স্ক ও বাচ্চাদের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর। এজন্য শীতকালে বয়স্ক ও বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত যত্ন। তাদের সুরক্ষায় অতিরিক্ত সচেতনতা ও সাবধানতা জরুরি।

শীতে শিশুর যত্নে করণীয়

শীতকালে নবজাতকের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। কারণ নবজাতকের তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা খুবই কম, তাই অল্প শীতেই তারা কাবু হয়ে যায়। যে বাচ্চা পূর্ণ ৩৭ সপ্তাহ মাতৃগর্ভে কাটিয়ে জন্ম নিয়েছে তার ক্ষেত্রে জটিলতা কম। শিশুকে উষ্ণ তাপমাত্রায় রাখতে হবে। যদি ঘরের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়, তবে সুতির কাপড় পরিয়ে কাঁথা দিয়ে মুড়ে রাখুন। এ মাত্রার নীচে হলে সোয়েটার ব্যবহার করতে পারেন।

শীতে নবজাতককে অবশ্যই হাতমোজা, পা-মোজা ও কানটুপি পরাতে হবে। উল বা পশমে অ্যালার্জি হলে এগুলো পরিহার করে ভারী সুতির জামা পরান। সন্ধ্যার পর বাইরে না বের হলেই ভালো।

দেড় মাস থেকে এক বছর বয়সি শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী উষ্ণ রাখুন। শিশুকে বুকের দুধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে। ছয় মাসের বেশি হলে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার দিন।

সোয়েটার ও পায়জামার পাশাপাশি শিশুদের হাত, পা, কান আবৃত করে রাখতে হবে। তবে শিশুদের উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে সুতি কাপড় পরিয়ে তার ওপর উলের পোশাক পরানো উচিত। কারণ উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। শিশুদের রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুল হাতা গেঞ্জি পরিয়ে রাখুন এবং সকালে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ও বিকালের দিকটাতে হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে রাখতে পারেন।

শীতে শিশুদের খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। ঘন ঘন পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। যেমন- ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ এবং ফলের রস; বিশেষ করে গাজর, বিট, টমেটো শিশুদের জন্য বেশ উপকারী। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে পারেন। শিশুরা এ সময় যেন কোনো ধরনের ঠান্ডা খাবার না খায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

শিশুদের ত্বক বড়োদের থেকে অনেক বেশি সেনসিটিভ। তাই তাদের ত্বক অনেক বেশি রুক্ষ হয়ে যায়। শিশুর মুখে ও সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

বাচ্চাকে স্কুলে পাঠালে পরস্পরের মাধ্যমে শীতকালে কিছু সংক্রমণ রোগ ও ছোঁয়াচে চর্মরোগ বিস্তার লাভ করে। তাই শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখুন। নিয়মিত লোশন লাগান যেন ত্বক শুষ্ক হয়ে না যায়।

শিশুদের শীতকালীন শাকসবজি ও ফল বেশি করে খেতে দিন। শিশুর রুমে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুকে নিয়মিত হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে।

খেলাধুলা খুবই জরুরি। খেলাধুলা শরীরে রোগ প্রতিকার ক্ষমতা বাড়ায়। পানিশূন্যতা থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য সময়মতো কুসুম গরম পানি পান করাতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া শিশুকে বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। সর্দি-কাশি/জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বয়স্কদের যত্ন

শীতে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় থাকে প্রবীণ জনগোষ্ঠী। কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম থাকার কারণে সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্টসহ ঠান্ডাজনিত রোগে সহজে আক্রান্ত হন। বয়স্করা সারাবছর কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত থাকেন। শীতের তীব্রতায় তাদের হাঁপানি, নিউমোনিয়া, শ্বাসনালি প্রদাহ– এসব রোগ মারাত্মক হয়ে উঠে। এজন্য শীতে বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্যান্য সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে।

শীতের সময় শীত নিবারণে কয়েকটি পাতলা আরামদায়ক কাপড় নির্বাচন করা যায় এ ক্ষেত্রে। এতে ঠান্ডা কম লাগবে। কারণ কাপড়ের স্তরে স্তরে বাতাস জমা থেকে শরীর থেকে তাপ বাইরে বের হতে বাধা দেবে। শীতে প্রবীণদের শরীরের

তাপমাত্রা কমে গিয়ে হাইপোথারমিয়া হতে পারে। রাতে গলা ও কানে পাতলা কাপড় জড়িয়ে ঘুমালে ঠান্ডা লাগবে না। ঠান্ডা হাওয়া এড়িয়ে চলুন।

শীতে বয়স্কদের ত্বক, ঠোঁট, হাত-পা, নখসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন ক্রিমসহ প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করা যায়। শীতে শরীরের অয়েল গ্ল্যান্ড থেকে তেল কম নিঃসৃত হয় বলে ত্বক খসখসে ও শুষ্ক হয়ে পড়ে। ত্বকের সুরক্ষায় ময়েশ্চারাইজার লোশন, ভ্যাসলিন, গ্লিসারিন, অলিভ অয়েল এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। যখনই মুখ পানি দিয়ে পরিষ্কার করবেন, তখনই কোনো ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার মুখে ব্যবহার করুন।

শীতে বয়স্কদের সক্রিয় রাখা ভালো। শীতের দিন শুধু শুয়ে-বসে না থেকে প্রবীণ মানুষটিকে ঘরের ভেতর হালকা ব্যায়াম করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটিসহ হাত-পা নাড়াচড়া করতে বলুন। এতে শরীরে তাপ উৎপন্ন হবে, শীত কম লাগবে। তীব্র শীতে অ্যালার্জি, হাঁপানি, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিসের মতো রোগ হয়ে থাকে। ব্যায়াম করলে সর্দি-কাশি-জ্বর ইত্যাদি রোগ কম হয়।

কুসুম গরম পানি পান করতে হবে। এছাড়া গোসল, অজু ও অন্যান্য কাজেও গরম পানি দিতে হবে। এতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। পান করার জন্য কুসুম গরম পানির সঙ্গে গরম দুধ, ফলের রস, বিভিন্ন ধরনের স্যুপ খাওয়া যেতে পারে।

প্রবীণ ব্যক্তির ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এতে ঘর কিছুটা গরম থাকবে। এতে শীত কম লাগবে, আরাম অনুভব হবে।

ভিটামিন ডি প্রবীণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিটামিনের ৯০ ভাগ আনে সূর্যের আলো। শীতে প্রবীণরা যেহেতু বাইরে কম বের হন, তাই ভিটামিনের অভাব দেখা দিতে পারে। নিয়মিত সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ১৫-২০ মিনিট রোদে নিয়ে যাওয়া উচিত।

শীতে পানির চাহিদা কম থাকায় বয়স্করা পানি কম খান। এটি কিডনির কার্যক্ষমতা নষ্টসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য জটিলতা তৈরি করে। তাই শীতে বয়স্কদের প্রয়োজনীয় পানিসহ কেমিক্যালমুক্ত বিভিন্ন দেশি ফলের রস পান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বয়স্কদের প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ঘুম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে ঠান্ডা-কাশি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। তাই প্রবীণদের পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হবে।

বয়স্করা অনেক সময় বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন। ডিমেনশিয়া, আলঝেইমার ইত্যাদি। তাই তাদের আনন্দে রাখার চেষ্টা করুন। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখুন। সময় উপযোগী সবজি, ফল ও ভিটামিন এ, ডি, সি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান। হালকা গরম পানি পান করুন এবং গোসল করুন। গরম ও সহজপাচ্য খাবার দিন, বাসি ও ঠান্ডা খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। হাঁপানি শ্বাসনালির প্রদাহে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন প্রতিবছর গ্রহণ করুন। চর্মরোগ থেকে বিরত থাকার জন্য এবং ত্বককে উষ্ণ রাখার জন্য পর্যাপ্ত তেল মালিশ করুন।

শীত এলেই শিশু ও বয়স্করা নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়। বিশেষত প্রবীণরা অসুস্থ হয়ে যান দ্রুত। অনেকেই ভয় পেয়ে যান এতে। বিশেষত শিশু ও প্রবীণদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হওয়ায় তাদের সারতেও সময় লাগে অনেক। কিন্তু সচেতন হয়ে অল্পকিছু বিষয় খেয়াল রাখলে সহজেই এসব ঝামেলা এড়ানো যায়।

ডা. তানজিদা রহমান: মেডিকেল অফিসার, সার্জারি বহির্বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর, tanzidatoma404@gmail.com

পার্বত্য অঞ্চলে ১২টি বিদ্যালয়ে ই-লার্নিংয়ের উদ্বোধন

পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ১২টি বিদ্যালয়ে ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন প্রধান উপদেষ্টা। ২৭শে জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'যমুনা' থেকে ভার্চুয়ালি ই-লার্নিং কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা তাঁর বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ই-লার্নিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন মূলত প্রধান উপদেষ্টার একক চিন্তা ও চেতনারই ফসল। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ তিন জেলার প্রতিটিতে ১টি প্রাথমিক ও ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ মোট ১২টি স্কুলে ই-লার্নিং চালুর মধ্য দিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষার সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য কেবল এই ১২টি স্কুল নয় বরং প্রাথমিকভাবে ১৫০টি বা তার অধিক বিদ্যালয়কে ই-লার্নিং-এর আওতায় আনা। এতে যোগাযোগ ও পর্যটনসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পার্বত্য অঞ্চল আরো সমৃদ্ধ হবে। তিনি একটি বৈষম্যহীন, মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং সম্প্রীতি ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক পার্বত্য অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নগরজীবনে মানসিক স্বাস্থ্য: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

মো. মোস্তাক আহমেদ

দ্রুত নগরায়ণ আধুনিক সভ্যতার এক অনিবার্য বাস্তবতা। উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার সুযোগ মানুষের জীবনকে সহজ করেছে– এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই নগরজীবনের ঝকঝকে আলোর আড়ালেই নীরবে বেড়ে উঠছে এক গভীর সংকট– মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা। ব্যস্ততা, প্রতিযোগিতা ও যান্ত্রিক জীবনের চাপে শহরের মানুষ দিন দিন মানসিকভাবে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

শহরের জীবন মানেই সময়ের সঙ্গে দৌড়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অফিস, ব্যবসা, পড়াশোনা, যানজট– সব মিলিয়ে মানুষ যেন এক অবিরাম চাপের মধ্যে বসবাস করছে। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা ও লক্ষ্যপূরণের অতিরিক্ত চাপ মানুষের মানসিক ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ আর্থিক অনিশ্চয়তা ও সামাজিক প্রত্যাশার ভারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

যানজট নগরজীবনের আরেক বড়ো অভিশাপ। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকা মানুষের মধ্যে বিরক্তি, ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়, যা ধীরে ধীরে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সময়মতো কাজে পৌঁছাতে না পারা, পরিবারকে সময় দিতে না পারা– এসব বিষয় মানুষের মধ্যে অপরাধবোধ ও মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

নগরজীবনের সবচেয়ে বড়ো বৈপরীত্য হলো– চারপাশে মানুষ থাকলেও মানুষ একা। বহুতল ভবন, ফ্ল্যাট সংস্কৃতি ও ব্যস্ত জীবনধারা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে দুর্বল করে দিয়েছে। আগে যেখানে প্রতিবেশীদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেখানে এখন অনেকেই পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে তা জানেন না। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কথা বলার মানুষ না থাকা, অনুভূতি ভাগ করার সুযোগ না পাওয়া মানুষের মধ্যে একাকিত্ব বাড়িয়ে দেয়। একাকিত্ব থেকেই জন্ম নেয় হতাশা, উদ্বেগ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব।

প্রযুক্তি নগরজীবনকে সহজ করলেও এর অতিরিক্ত ব্যবহার নতুন সংকট তৈরি করেছে। স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের জীবনকে দখল করে নিচ্ছে। ভার্চুয়াল জগতে অন্যের সাজানো জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন তুলনা করতে গিয়ে অনেকেই নিজেকে ব্যর্থ মনে করছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ কমে যাচ্ছে, বাড়ছে মানসিক চাপ। বাস্তব সম্পর্কের পরিবর্তে ভার্চুয়াল যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীলতা মানুষের আবেগ প্রকাশের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ, সমস্যার মুখোমুখি হলে অনেকেই তা গোপন রাখছে, সাহায্য চাইতে সংকোচ বোধ করছে।

নগরজীবনে পরিবারের সঙ্গেও মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। কর্মজীবী বাবা-মা সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না, আবার সন্তানরাও বাবা-মায়ের মানসিক অবস্থার দিকে তেমন নজর দিচ্ছে না। ফলে পরিবার, যা একসময় মানসিক আশ্রয়ের সবচেয়ে বড়ো জায়গা ছিল, তা আজ অনেক ক্ষেত্রে কেবল একটি বসবাসের ইউনিটে পরিণত হয়েছে। প্রবীণদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট। সন্তানদের ব্যস্ত জীবনের কারণে অনেক প্রবীণ মানসিক অবহেলা ও একাকিত্বে ভুগছেন, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে।

আমি একজন আইনজীবী। পেশাগত দায়িত্বের ভারে প্রতিদিন আমাকে সংগত নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়– মামলার নথি, আদালতের সময়ানুবর্তিতা, মক্কেলের প্রত্যাশা ও ন্যায়বিচারের দায়। এর পাশাপাশি একজন মানুষ হিসেবে আমার রয়েছে ব্যক্তিগত সংসার জীবন– যেখানে পরিবারকে সময় দেওয়া, দায়িত্ব পালন করা এবং সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বৈত দায়িত্বের টানাপড়েনে মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আসলে এই অভিজ্ঞতা শুধু আমার একার নয়।

নগরজীবনে বসবাসকারী প্রায় প্রতিটি পেশাজীবী– চিকিৎসক, শিক্ষক, সাংবাদিক, কর্পোরেট কর্মকর্তা কিংবা ব্যবসায়ী-নিজ নিজ অবস্থান থেকে নানা ধরনের মানসিক চাপের মুখোমুখি হন। সময়ের অভাব, প্রতিযোগিতার চাপ, কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা, যানজট, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং পারিবারিক প্রত্যাশা– সব মিলিয়ে শহরের জীবন যেন এক অবিরাম দৌড়।

আমাদের সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য এখনো অবহেলার বিষয়। শারীরিক অসুস্থতাকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়, মানসিক সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অনেক সময় মানসিক সমস্যাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা হয়, যা মানুষকে মুখ খুলতে নিরুৎসাহিত করে। এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেকেই প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে দেরি করে, ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। নগরজীবনের চাপের সঙ্গে এই সামাজিক বাধা মানসিক স্বাস্থ্য সংকটকে আরও তীব্র করে তুলছে।

তবু এই চাপের মধ্য দিয়েই আমাদের এগিয়ে চলতে হয়। মানসিক সুস্থতা বজায় রেখে জীবনকে অর্থপূর্ণ করার চেষ্টাই নগরজীবনের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। সচেতনতা, আত্মসংযম, পারিবারিক ও সামাজিক সহায়তা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদার পরামর্শ গ্রহণ– এই করণীয়গুলোই আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ভিতকে দৃঢ় করতে পারে। কারণ সুস্থ মন ছাড়া সফল পেশাজীবন কিংবা সুখী সংসার– কোনোটিই সম্ভব নয়।

নগরজীবনে মানসিক স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। ব্যক্তি পর্যায়ে, নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন হতে হবে। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম, নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন হলে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়াকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহমর্মিতা বাড়াতে হবে। পরিবারের সদস্যদের অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ একাকিত্ব কমাতে সহায়ক।

রাষ্ট্র ও নগর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, শহরকে মানুষের জন্য বাসযোগ্য করতে হবে। খেলার মাঠ, পার্ক ও উন্মুক্ত জায়গা বাড়ানো, কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং সরকারি পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা জরুরি। একই সঙ্গে গণমাধ্যমের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতি এবং মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০৩০ তৈরি করেছে, যার লক্ষ্য মানসিক স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্যখাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনায়– মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকে প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তর পর্যন্ত সর্বাধিক নাগালের আওতায় আনা; সকল নাগরিকের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য, সুলভ ও মানসম্মত করা; মানবাধিকারভিত্তিক ও সমন্বিত সহায়তা নিশ্চিত করা– বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

নগরজীবন আধুনিকতার প্রতীক হলেও এর চাপে যদি মানুষের মন ভেঙে পড়ে, তবে সেই উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে যায়। সুস্থ শহর গড়তে হলে শুধু অবকাঠামো নয়, সুস্থ মনও প্রয়োজন। নগরজীবনে মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া এখন আর বিলাসিতা নয়– এটি সময়ের দাবি। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র একযোগে উদ্যোগ নিলেই কেবল এই নীরব সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব।

মো. মোস্তাক আহমেদ: আইনজীবী ও ফ্রিল্যান্সার লেখক

জুলাই যোদ্ধাদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্সের উদ্বোধন করলেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব

জুলাই যোদ্ধাদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা। তিনি ১২ই জানুয়ারি ঢাকায় কল্যাণপুরে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে আহত জুলাই যোদ্ধাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই) আয়োজিত ১০টি কোর্সের প্রথম পর্যায়ের ৫টি কোর্সের উদ্বোধন করেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে বেসিক ফিল্ম, চিত্রনাট্য লিখন, চলচ্চিত্র সম্পাদনা, সেট ডিজাইন এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ বিষয়ক পাঁচটি কোর্স।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা বলেন, প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরু করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি এ কোর্সের পরিকল্পনাকারী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলমকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। বিভিন্ন আর্থিক, প্রশাসনিক জটিলতা সমাধান করে কোর্সটি আয়োজনের সদিচ্ছার জন্য তিনি বিসিটিআই-এর প্রধান নির্বাহীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তিনি জুলাই ফাউন্ডেশনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিসিটিআই-এর প্রধান নির্বাহী আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি কোর্সে ৮০ জন জুলাই যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠান শেষে এসময় সচিব মাহবুবা ফারজানা বিসিটিআই-এর নতুন সাউন্ড রেকর্ডিং স্টুডিও উদ্বোধন করেন।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শেষের কবিতা*: প্রেম, স্বাধীনতা ও বাস্তববোধের অনন্ত সংলাপ

আজহার মাহমুদ

বাংলা সাহিত্যের প্রেমধর্মী উপন্যাসগুলোর ধারায় এক অভিনব সৃষ্টিকর্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শেষের কবিতা*। যেখানে প্রেমকে পরিণতি নয়, বরং একটি উপলব্ধি, একটি বোধে রূপান্তরিত করে চিত্রিত করা হয়েছে। এই উপন্যাসটি প্রথম পাঠে মনে হয়, অমিত ও লাবণ্যকে ঘিরে একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনি রচিত হচ্ছে; কিন্তু পাঠ যত এগোয়, দেখা যায় গল্পের বাহ্যিক প্রেমই আসল নয়– আসল হলো প্রেমকে উপলব্ধি করার দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনতার মূল্যবোধ এবং মানুষের মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্মরূপ। এ উপন্যাসে প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ, কাব্যিক ছন্দময়তার পাশাপাশি হাস্যরসও আছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিত রায় এমন এক মানুষ, যিনি স্বাধীনচিন্তার শক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম কোনো বাঁধাধরা নিয়মে চলতে পারে না। প্রেমকে তিনি দেখেন নন্দনবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মতৃপ্তির আলোকে। তাঁর কথায়, হাসিতে, সংলাপে একদিকে যেমন ইংরেজি সাহিত্যচেতনার প্রভাব, তেমনি বাঙালি অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গও পাওয়া যায়। অমিতের এই মুক্তমনই লাবণ্যকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু একই সঙ্গে লাবণ্য উপলব্ধি করেন, অমিতের এই উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীন জীবনের বাস্তব পথে তাঁকে স্থির করে রাখবে না।

লাবণ্য চরিত্রটি *শেষের কবিতা*'র সবচেয়ে পরিণত ও সংযমী অংশ। তিনি প্রেমকে গভীরভাবে অনুভব করেন। কিন্তু প্রেমকে আবেগের অতলে নিমজ্জিত হতে দেন না। তিনি জানেন প্রেমের আনন্দ যেমন আছে, তেমনি এর পৃথিবীব্যাপী বাস্তবতারও গুরুত্ব রয়েছে। প্রেমের কাছে নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে তিনি নারাজ। তাই তিনি বুঝে ওঠেন, অমিতের সঙ্গে তাঁর প্রেম সত্য হলেও, তা সংসারের বাস্তবতায় টিকবে না। এই উপলব্ধির জায়গাটি রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে আঁকেন। প্রেমকে তিনি এখানে কোনো ব্যর্থ রূপ দেননি, বরং এটিকে চরিত্রের পরিণতি হিসেবে দেখিয়েছেন। প্রেমের গভীরতা তাদের জীবনের দুজনকে আরও সুন্দর করে তোলে, যদিও তারা একসঙ্গে চলতে পারে না।

অমিত ও লাবণ্যের এই দূরত্বের মধ্যেই উপন্যাসের দার্শনিক শক্তি। সাধারণ প্রেমের কাহিনি মিলনে শেষ হয়। রবীন্দ্রনাথ বরং দেখালেন, বিচ্ছেদও প্রেমের একটি সুক্ষ্মরূপ হতে পারে। মিলন সবসময় শ্রেষ্ঠ নয়, কখনো বিচ্ছেদই সত্যিকারের উপলব্ধির জন্ম দেয়। দুই মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসলেও, তাদের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের গতি আলাদা হতে পারে। আর সেই ভিন্নতার প্রতি যত্নশীল হওয়াই প্রেমের পরিপক্বতা।

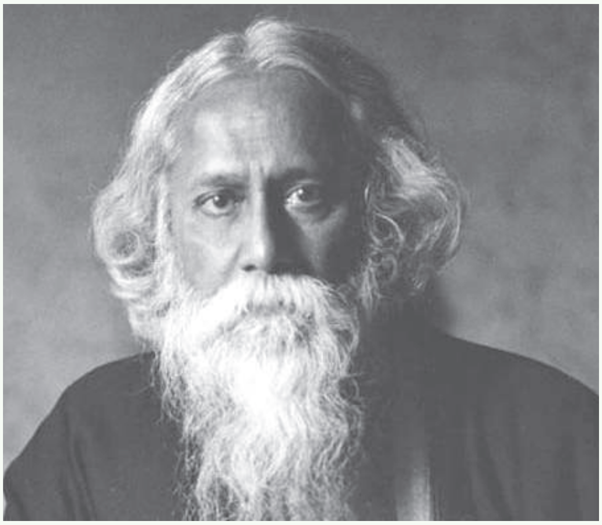

উপন্যাসের পরবর্তী অংশে কেতকীর সঙ্গে অমিতের সম্পর্ক এই দর্শনকেই অন্য দৃষ্টিতে প্রমাণ করে। এখানে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, জীবনে সবকিছু নন্দনতত্ত্ব দিয়ে মাপা যায় না। মানুষ যখন সংসার, পরিবার, দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন অধিক বাস্তববোধ জরুরি হয়ে ওঠে। কেতকী সেই বাস্তবতার প্রতীক। অমিত তাঁর কাছে খুঁজে পান এক পৃথিবীমুখী দৃঢ়তা, যা লাবণ্যর ক্ষেত্রে ছিল না। ফলে উপন্যাসটি দুটি ভিন্ন নারীর ভিন্ন জীবনদর্শনকে মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং তাতেই এর গভীরতা তৈরি হয়।

*শেষের কবিতা*র ভাষা নিজেই একটি স্বতন্ত্র শিল্প। রবীন্দ্রনাথ এখানে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং মৃদু রসিকতা ব্যবহার করেছেন, যা পুরো উপন্যাসকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে তোলে। অমিতের সংলাপ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতায় ভরা, তেমনি লাবণ্যের কথায় রয়েছে এক গভীর উপলব্ধি। ভাষার এই প্রবাহমান সৌন্দর্য পাঠককে কখনো দার্শনিক মননে ডুবিয়ে দেয়, কখনো আবার হাস্যরসের হালকা ছোঁয়ায় আরাম দেয়।

*শেষের কবিতা*য় বিশেষ কিছু লাইন হৃদয়কে দারুণ স্পর্শ করে। যেমন– 'পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর'। 'যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে'। 'শিকলওয়ালা বাঁধে বটে কিন্তু ভোলায় না, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে ভোলায়ও'। 'পৃথিবীতে হয়ত দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না'।

'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ের তফাৎ আছে। যা আমার ভালো লাগে তাই আর একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত'। 'ভালোবাসায় ট্রাজেডি সেখানেই ঘটে যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি'।

সবশেষে, উপন্যাসের নাম *শেষের কবিতা* হলেও এর 'শেষ' কোনো শেষ নয়। বরং এটি এমন এক উপলব্ধির দরজা খুলে দেয়, যেখানে প্রেমকে পাওয়া ও হারানোর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে নতুনভাবে চিনে নেয়। প্রেমের অর্থ শুধু এক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং কখনো আলাদা হতে শেখাতেও প্রেম সাহায্য করে। অমিত ও লাবণ্য দুজনেই প্রেমে পরাজিত হয়নি, বরং তারা প্রেমকে উপলব্ধির উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

এভাবেই *শেষের কবিতা* প্রেমকে বইয়ের পাতায় স্থির করে রাখে না, প্রেমকে মানুষের স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও স্বতন্ত্র সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে এক অনন্য মানবিক অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তাই এটি কেবল একটি প্রেমের উপন্যাস নয়, এটি প্রেমের উপলব্ধি নিয়ে লেখা একটি দার্শনিক গ্রন্থ– যেখানে প্রেম মিলনের নয়, পরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পায় বিচ্ছেদের মধ্যেই।

আজহার মাহমুদ: লেখক ও সাংবাদিক,
azharmahmud705@gmail.com

বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬

বনভূমির দখল প্রতিরোধ, বনভূমির ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বন ও বনভূমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ, বনভূমির পরিমাণ হ্রাস রোধকল্পে এবং বৃক্ষ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। ৬ই জানুয়ারি আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে এ গেজেট জারি করা হয়।

এ আইন অনুযায়ী প্রাকৃতিক বন কোনো বনবিরুদ্ধ বা বন বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা যাবে না, তবে অন্যান্য বনভূমির ক্ষেত্রে শুধু অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজনে এবং অন্য কোনো বিকল্প না থাকলে নিরপেক্ষ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি, বিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর ঝুঁকি বিবেচনা করে মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে সরকার বনভূমির বনবহির্ভূত ব্যবহার (Non-Forest Use) অনুমোদন করতে পারবে। অনুমোদন ব্যতীত বনভূমির বন বহির্ভূত ব্যবহার বা বন বিরুদ্ধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

এ আইনে দুইটি তালিকা থাকবে, যার একটিতে কর্তন নিষিদ্ধ গাছের প্রজাতির বৃক্ষের নাম উল্লেখ থাকবে; যা কোনোক্রমেই কর্তন করা যাবে না। অন্য আর একটি তালিকায় বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে কর্তনযোগ্য বৃক্ষপ্রজাতির নাম উল্লেখ থাকবে। কর্তন নিষিদ্ধ প্রজাতির বৃক্ষ কর্তনের জন্য সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং অনুমতি সাপেক্ষে কর্তনযোগ্য বৃক্ষ বিনা অনুমতিতে কর্তনের জন্য সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই আদালত অপরাধীকে অতিরিক্ত দণ্ড হিসেবে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের শাস্তিও প্রদান করতে পারবে।

কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমির অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নভাবে এক একরের নীচে কোনো বনভূমি থাকলে অপরিহার্যতা ও জনস্বার্থে বিবেচনায় এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের অনুমোদনক্রমে বিনিময়ের অনুমতি প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, এ আইনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদিত বৃক্ষ প্রজাতি (যেমন- আগর) ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো প্রজাতির বৃক্ষে পেরেক বা ধাতব বস্তু দ্বারা ক্ষতি সাধন না করার বিধান রাখা হয়েছে; যা অমান্য করলে সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, এ আইনে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণে সাধারণ করণীয় বিষয়েরও বিধান রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদন: প্রণব দাশ

কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার

সুজন শাহরিয়ার

কম্পিউটারে বাংলা লেখা– মাতৃভাষায় কাজ করার স্বাচ্ছন্দ্য, দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। এটি কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে, ওয়েবসাইট, ব্লগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলা কন্টেন্ট তৈরিতে সহায়তা করে, যা দৈনন্দিন কাজগুলোকে আরও সহজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে। কম্পিউটারে বাংলা ভাষার ব্যবহার বর্তমানে অত্যন্ত সহজ ও জনপ্রিয়, যা মূলত ইউনিকোড-ভিত্তিক 'অভ্র' এবং 'বিজয়' কী-বোর্ড, বিভিন্ন ফন্ট এবং প্রসেসিং সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে । বাংলা লেখার মাধ্যমে এই প্রযুক্তির সূচনা হয়, যা এখন অফিস, শিক্ষা, গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা ভাষা কম্পিউটারে প্রবেশ করায় তা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে।

কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ৪১ বছরে পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারে অনেক উন্নতি হয়েছে। মুদ্রণ শিল্প আধুনিক হয়েছে।

১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার এলেও, বিগত প্রায় চার দশক পেরিয়ে বাংলা টাইপ রাইটার থেকে ইউনিকোড-ভিত্তিক ফন্ট এবং বিজয়-অভ্র হাত ধরে ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রচলন হয় প্রায় ৪১ বছর আগে। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণ প্রকৌশলী সাইফুদ্দাহার শহীদ তার মাকে বাংলা ভাষায় কম্পিউটারে টাইপ করে একটি চিঠি লেখেন। দিনটা ছিল ১৯৮৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি। ফলে এই দিনটাকে অনেকে কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রচলনের দিন মনে করেন।

বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে ব্যবহারের প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হয় প্রকাশনা শিল্পে, আশির দশকের মাঝামাঝি। তা মেটাতে তখনকার সফ্টওয়্যার নির্মাতারা বেশ কিছু সমাধান তৈরি করেন। সেগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল– প্রচলিত বাংলা টাইপরাইটারে ব্যবহৃত অক্ষর-বিন্যাসে যারা অভ্যস্ত তাদের জন্যে শেখা সহজ কোনো অক্ষরবিন্যাস কম্পিউটার কী-বোর্ডের জন্য তৈরি করে

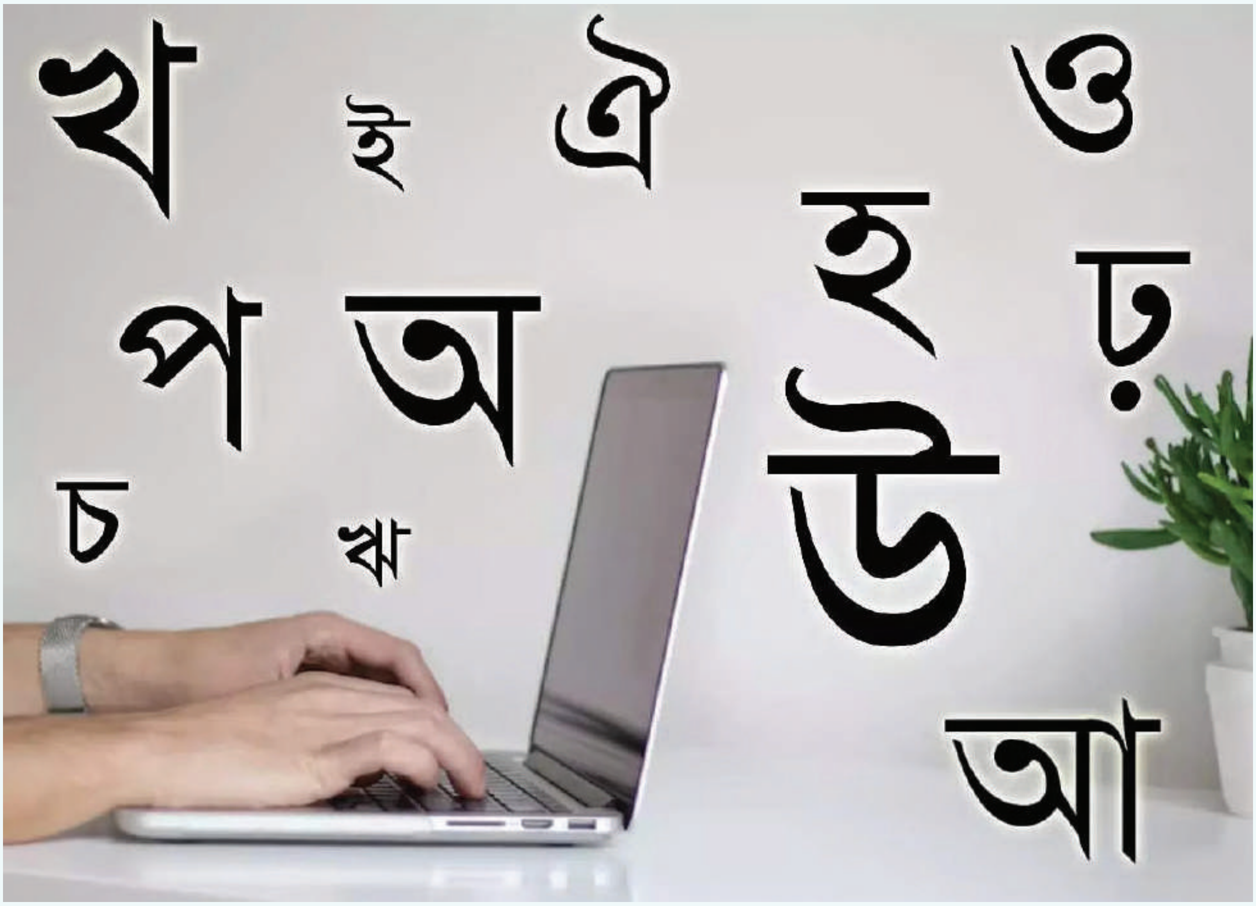

তার মাধ্যমে লেখাকে কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা এবং ছাপার যোগ্য কোনো ফন্টের মাধ্যমে সেটাকে মনিটরে দেখানো বা প্রিন্টারে ছাপানোর ব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য, কম্পিউটার সংখ্যা ছাড়া কিছু বোঝে না, সেজন্য বর্ণমালার প্রতিটা বর্ণকে একেকটা সংখ্যাভিত্তিক কোড বা সংকেত দিয়ে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু ইংরেজিভাষীরা কম্পিউটার প্রথম তৈরি করে, শুরুর দিকে তাদের তৈরি ২৫৬ কোডের সংকেতমালা আসকিতে ইংরেজি বা ল্যাটিন গোত্রের ভাষাগুলো ছাড়া অন্য ভাষা প্রকাশের জন্য কোনো সংকেতের ব্যবস্থা তারা মাথায় রাখেনি। বিশ্বের সব ভাষার বর্ণমালাকে প্রকাশের জন্য সংকেতমালা ইউনিকোড এসেছে অনেক পরে। তাই প্রথম দিককার বাংলা-লেখনী সফ্‌টওয়্যারগুলোকে ২৫৬ সংকেতের সংকেতমালার মধ্যেই বর্ণমালাকে প্রকাশের চিন্তা করতে হয়। এছাড়া পাশাপাশি আলাদা দুটি অক্ষরকে যুক্তাক্ষর হিসেবে প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা তখন কম্পিউটারে না থাকায় বাংলার প্রচলিত যুক্তাক্ষরগুলোকে আলাদা বর্ণ হিসেবে ধরে নিয়ে সংকেতমালা তৈরি করতে হয়।

সাইফুদ্দাহার শহীদ ম্যাকিন্টোশের যশোর ফন্ট এবং কী-বোর্ড লেআউট শহীদলিপি বানিয়েছিলেন। সেটি পরে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ব্যবহার হয়েছিল। ম্যাকরাইট নামে বাংলায় সফ্‌টওয়্যার তৈরি করে পরবর্তী সময়ে তা ২-৩টি পত্রিকা ব্যবহার করেছিল। ১৯৮৬ সালে সৈয়দ মাইনুল হাসান তৈরি করেন মাইনুললিপি নামক একটি বাংলা ফন্ট। এর সুবিধা ছিল কোনো ড্রাইভার বা সফ্‌টওয়্যার ছাড়াই এ ফন্ট দিয়ে ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারে সহজে বাংলা লেখা যেত। যুক্তাক্ষর সমস্যার জন্য তৈরি করা হয় চার লেয়ারের কী-বোর্ড। ১৯৮৭ সালের ১৬ই মে আনন্দপত্র প্রকাশের মাধ্যমে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় বিজয় কী-বোর্ড। বিজয় সফ্‌টওয়্যারে রয়েছে ১০৮টি ফন্ট। বৈচিত্র্যময় সব ফন্টই রয়েছে বিজয়ে। এসবের পাশাপাশি ডা. মেহেদী হাসান খানের উদ্ভাবিত অভ্র অনলাইনে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়।

বাংলাদেশে ১৯৯০-এর দশকের পর থেকেই কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে এটি দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তি জনগণের নাগালে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিজের ভাষায় যোগাযোগের প্রয়োজনে ব্যবহারকারীরা প্রচলিত ইংরেজি কী-বোর্ডের মাধ্যমে বাংলা লিখতে শুরু করেন। কয়েক বছরের ব্যবধানে মোটামুটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তরুণ প্রজন্ম প্রায় সর্বাংশে এরকম রোমান হরফে বাংলা লিখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমান সময়ে অনলাইনে লেখালেখিতে জনপ্রিয়তা পায় সোনারবাংলা, রিদমিক ইত্যাদি। আর বাংলা ভাষা এখন আর শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নেই। প্রযুক্তির উৎকর্ষে ইন্টারনেট দুনিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতিটি শব্দ। সেই চেষ্টার ফসল হিসেবে একপর্যায়ে আবির্ভূত হয় ওয়েবভিত্তিক বাংলা অ্যাপ্লিকেশন এবং সফ্‌টওয়্যার। বর্তমানে অভ্র, বিজয় এবং বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক টুলসের মাধ্যমে কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ হয়ে উঠেছে। ইন্টারনেট ব্রাউজিং, দাপ্তরিক কাজ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বাংলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। জনপ্রিয় কী-বোর্ড লেআউট: অভ্র (ফনেটিক ও মাউস), বিজয় (প্রচলিত), এবং মুনীর-অপটিমা, যা শিক্ষা, ব্যাংকিং, ইন্টারনেট সার্চ এবং কন্টেন্ট তৈরিতে অপরিহার্য।

কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সহজ ও সাবলীল যোগাযোগ করা যায়। অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, ই-মেইল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগের গতি ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়। তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচার কাজে আসে গতিময়তা। ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য, গবেষণাপত্র ও তথ্য সংরক্ষণ এবং তা বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। সরকারি-বেসরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ সহজ হয়। আর কন্টেন্ট তৈরি ও সামাজিক মাধ্যমে মতপ্রকাশ করা যায় নিজের ভাষায়। ব্লগ, ওয়েবসাইট, এবং Facebook/YouTube-এ কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে নিজেদের ভাবনা বা মতামত বাংলায় প্রকাশ করা যায়।

সুজন শাহরিয়ার: প্রাবন্ধিক

পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের ছবি বা ভিডিও শেয়ার করলে এনআইডি ব্লক করা হবে

পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের ছবি বা ভিডিওচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের এনআইডি ব্লক করাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩রা জানুয়ারি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সূত্রে একথা জানানো হয়। নির্বাচন কমিশনের বার্তায় বলা হয়, পোস্টাল ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করা ভোটারের অধিকার ও দায়িত্ব। ভোট দেওয়ার তথ্য বা ব্যালটের ছবি বা ভিডিওচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র ব্লক করাসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টাল ভোটের যে-কোনো ধরনের পোস্ট বা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্বাচন কমিশন অনুরোধ জানায়।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

ডিএফপির মহাপরিচালক পিঠা মেলা উদ্বোধন করছেন

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম জানুয়ারি ২০২৬

আনন্দঘন পরিবেশে পিঠা মেলা

শীতের সকালের হিমেল হাওয়ায় যখন চারপাশ আচ্ছন্ন, তখনই ভাপা আর চিতই পিঠার গরম ভাপ আর নলেন গুড়ের মৌ মৌ গন্ধে মুখরিত হয়ে উঠে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত ব্যতিক্রমী ও প্রাণবন্ত 'পিঠা মেলা' তথ্য ভবন প্রাঙ্গণে ১৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে কর্মব্যস্ততার মাঝে আনন্দঘন পরিবেশে পিঠা মেলার আয়োজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে এক মিলনমেলার আবহ তৈরি করে।

পিঠা মেলার ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগম। এ সময় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল জলিলসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিরা স্টলগুলো ঘুরে দেখেন এবং বাঙালির এই লোকজ সংস্কৃতিকে ধরে রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মেলায় বিভিন্ন স্টলে ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন পিঠার পসরা সাজানো হয়। প্রতিটি স্টল ছিল মজাদার ও বৈচিত্র্যময় পিঠায়

মজার মজার পিঠা

পরিপূর্ণ। কোনো কোনো স্টলে তৈরি হয়েছিল ভিন্নরকম আবহ। বর্ণিল পিঠার সঙ্গে বাড়তি পাওনা ছিল আকর্ষণীয় ঝালমুড়ি কিংবা সুস্বাদু মোয়া ইত্যাদি। এখানে নানান রকম পিঠাপুলির শুধু প্রদর্শনী হয়নি, হয়েছে দেদারছে বিক্রি। পিঠার মূল্য সাশ্রয়ী থাকায় পিঠা বিক্রি ভালো হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে মেলায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন স্টল থেকে পিঠা সংগ্রহ করে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সব স্টলের পিঠা বিক্রি শেষ হয়। অনেকে দেরিতে আসায় পিঠা না-পাওয়ায় আক্ষেপ করেছেন। অপেক্ষায়

রইলেন আবার পিঠা মেলার। তবে পিঠা খেয়ে প্রশংসা করেছেন অভিজ্ঞজন। প্রশংসিত হয়েছে শুধু পিঠা নয়, পুরো আয়োজনটিও। অফিসের ব্যস্ততার মাঝেও শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ পিঠা বানানোর ন্যায় কঠিন কাজটি করে যারা স্টল নিয়েছেন, পিঠার স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের জন্য প্রণোদনা রয়েছে বলে জানান কর্তৃপক্ষ। মেলার বিক্রেতা ও ক্রেতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মনে হয়েছে– শেষ হয়েও হলো না শেষ। আবার শীতে পিঠা মেলার জন্য অপেক্ষা। মেলাটি সংশ্লিষ্ট সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মিলনমেলায় পরিণত হয়।

প্রতিবেদন: সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ, ডিএফপি

নিয়তি

অদ্বৈত মারুত

হাসপাতালের কক্ষে সায়মা একা– বিষণ্ন, বিধ্বস্ত। সাদা দেয়ালের দিকে তার দৃষ্টি এমনভাবে স্থির হয়ে আছে, যেন দেয়ালটি আর দেয়াল নেই, সময়ের পাতলা এক পর্দা। তার ওপাশে একসঙ্গে ঝুলে আছে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। সে কি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একসঙ্গে দেখছে? নাকি সেসবের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে, তা বোঝা যায় না। মানুষমাত্রই নিজের জীবনের জটিল অংক মেলাতে চায়– কখনও শব্দে, কখনও দীর্ঘ নীরবতায়। আর এই নীরবতার ভেতরেই আমি আবিষ্কার করি চুপচাপ বয়ে চলা এক গভীর নদী, যার ঢেউ খুব মৃদু, প্রায় অদৃশ্য, অথচ স্রোত গভীর। সেখানে সময় ছোটো ছোটো পাথর হয়ে দ্রুত ভেসে যায়, প্রতিটি পাথর যেন একেকটি স্মৃতিচিহ্ন– নিঃশব্দে, অনুভূতির ভেতরে ঢোকার আগেই জীবনের বাঁক, শত গল্প হয়ে আছে।

আমাদের কারও কখনও মনে আসেনি যে, একদিন এই সহজিয়া স্বচ্ছতা হারিয়ে যাবে। তখন জীবন ছিল খোলা জানালার মতো, পরিপূর্ণ আলো আসত, বাতাস আসত। আমরা ভেবেছিলাম, প্রেম মানে শুধু অনুভূতি, শুধু কাছে থাকা, শুধু একসঙ্গে হেঁটে

যাওয়া। দায়িত্ব মানে ছিল বহুদূর দিগন্তের কোনো শব্দ, ভবিষ্যৎ ছিল অস্পষ্ট এবং তা ভয়ডরহীন। অথচ একদিন এই প্রেম আর দায়িত্ব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভারী এক অনুভূতিতে রূপ নিলো। সেই অনুভূতি ধীরে, নিঃশব্দে হৃদয়কে চেপে ধরল। বুকে জমে উঠল এক আবরণ, যা খুলে ফেলার মতো সাহস আমাদের দুজনের কারও আর থাকল না। ঠিক যেন বহুদিন ধরে জমে থাকা এক কুয়াশা– আলো ঢুকতে দেয় না, আবার পুরোপুরি অন্ধকারও নয়; এ এমন এক প্রপঞ্চ, যার ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে চোখ অভ্যস্ত হয়ে যায়।

নকুলের ফোনের পর সবকিছু হঠাৎ বদলে গেল। যে পরিকল্পনাগুলো খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, সেগুলো মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল। তখন মনে হয়েছিল, সময় বুঝি থেমে গেছে; কিন্তু সময় তো আর থামে না, সময় তো উল্টো ঘুরে আমাদের চারপাশে চক্কর কাটতে থাকে, অদৃশ্য এক চাপ তৈরি করে, যেমন নদীজল ধীরে ধীরে পাথরের গায়ে গিয়ে পড়ে কোনো শব্দ না করেও নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। সেই চাপ আমাদের মনে করিয়ে দিলো, বাস্তবতা আর অতীতের স্বপ্ন কখনও এক বিন্দুতে এসে মেশে না, তারা পাশাপাশি চলে, কখনও স্পর্শ করে, কখনও শুধু ছায়া বিনিময় করে দূরে সরে যায় আর সেই দূরত্বে জন্ম নেয় এক ধরনের ব্যথা– যা খুব চেনা, তা অস্বীকার করা যায় না।

সায়মা তার ছোট্ট শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শিশুটির মুখে এক অদ্ভুত নির্ভার হাসি, যেন কোনোকিছুর ভার সে নিতে জানে না, কোনো হিসাব বোঝে না। সেই হাসি যেন সায়মাকে কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভাষা নেই, কেবল ধোঁয়াশা, এক ধরনের নীরব আহ্বান। মনে হয়, অনুভূতি আর সময়ের মাঝখানে এক অদৃশ্য সেতু তৈরি হয়ে গেছে। সেই সেতু দিয়ে হেঁটে সায়মা তার প্রেম, সংসার আর দায়িত্বের ভেতরে নতুন কোনো অর্থ খুঁজে যাচ্ছে। কিন্তু সেই অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় না, ধরেও রাখা যায় না; তা কেবল হৃদয়ে ঢেউ তোলে, হৃৎস্পন্দনের গভীরে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগায়।

সায়মার দিকে তাকিয়ে আমিও ডুবে যাই একই ভাবনায়। তখন বুঝতে পারি, প্রেম শুধু অনুভূতি নয়, প্রেম এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলায়, দায়িত্বের সঙ্গে বিশেষ রূপ নেয়, ভবিষ্যতের অজানা সম্ভাবনার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। প্রেম নিজেকে বার বার ভাঙে, আবার নিজেকে গড়ে আর সেই গড়ার ভেতরে কখনও সচেতনভাবে, কখনও অনিচ্ছায় আমরা সবাই বন্দি হয়ে পড়ি।

হঠাৎ লক্ষ করি, সায়মার চোখে এক অদ্ভুত আলো। সেই আলোয় অতীত, বর্তমান আর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ একসঙ্গে নড়ে ওঠে নদীতে প্রবল ভাঁটার মতো, যেখানে দিকগুলো আলাদা নয়, যেখানে এগোনো আর ফিরে যাওয়া একই স্রোতে মিশে যায়। সেই মিলনের ভেতরেই শব্দহীন, দৃশ্যহীন প্রেমের এক নীরব পুনর্জাগরণ ঘটে। সে কিছু বলে না, অথচ তার অনুভূতি দিয়ে আমাকে বলে যায়– জীবন মানে শুধু দায়িত্ব নয়, জীবন মানে ভালোবাসাও।

এই ভাবনা আমাকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। সেখানে সংসারের বোঝা, অর্থের চাপ, শিশুর দায়িত্ব দূরের পাহাড়ের মতো মনে হতে থাকে। পাহাড়টি স্পষ্ট দেখতে পাই। তা স্পর্শ করা যায় না, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করাও যায় না। সেই পাহাড়ের বিপরীতে প্রেম মৃদু আলোর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, এর অস্তিত্ব কেবল ছায়ার ভেতরই ধরা পড়ে। সেই আলো ধীরে ধীরে হৃদয়কে জড়িয়ে ধরে, বুকে এক অদ্ভুত উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয়।

হাসপাতালের কক্ষের নীরবতা আরও ঘনীভূত হয়ে আসে। প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন নিকষ আঁধারের মতো ধেয়ে আসে। সায়মা বসে থাকে, কোলে তার ছোট্ট শিশু, চোখে অস্থিরতা– অনুভূতি আর বাস্তবতার ভেতরে সে এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। আমিও সেই স্থিরহীনতায় ঢুকে পড়ি। সংসার, অর্থ, স্মৃতি, প্রেমের অদৃশ্য উত্তেজনা একসঙ্গে মিশে এক ধরনের নতুন আবেশ তৈরি করে আর আমরা সেই আবেশাচ্ছন্নের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত হাঁটতে থাকি।

নকুলের উপস্থিতি, তার ফোন, তার ছুটে আসা সময়কে আবার দৃশ্যমান করে তোলে। প্রতিটি পদক্ষেপে বোঝা বাড়ে, আশ্চর্যজনকভাবে প্রেমও নিঃশব্দে ভেতরে জেগে ওঠে, যেমন নদীর জল বালি আর পাথরের ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে। সেই চাপ থেকেই জন্ম নেয় দায়িত্ব আর আবেগের মাঝখানে আরেকটি অদৃশ্য সেতু। তারা কখনও হাত ধরে দাঁড়ায়, কখনও দূরে সরে যায়, আর সেই দূরত্বে প্রেম আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলেও উচ্চারণ করার সাহস আমাদের কারও থাকে না।

সায়মা শিশুটিকে কোলে নিয়ে হাসে। সেই হাসির ভেতর আনন্দ আছে, আবার দুঃখও আছে। তখন আমি বুঝতে পারি, প্রেম বদলায়নি, শুধু নতুন জায়গা খুঁজে নিয়েছে। সংসার, অর্থ, শিশু, স্মৃতি মিলিয়ে চারপাশে এক ধূসর আভা আর সেই ধূসরতার মাঝেই প্রবল হয়ে থাকে নিঃশব্দে অদৃশ্য প্রেম। আমাদের চোখ একে অপরের সঙ্গে নীরবে মিলিত হয়। এই নীরবতাই বলে দেয়, সময়ের ভেতর, দায়িত্বের ভেতর, বাস্তবতার ভেতর দিয়ে ভালোবাসা বহন করতে হয়। সব মুহূর্ত মিলিয়ে এক অদ্ভুত সেতু তৈরি হয়। আমরা সেই সেতুর ওপর দায়িত্ব আর আবেগ নিয়ে সমান্তরালে দাঁড়িয়ে থাকি। প্রেম নীরবে নিজের গতিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। সায়মার চোখে আমি দ্বন্দ্ব দেখি, নিজের চোখে এক ধরনের স্বীকৃতি পাই। স্মৃতি আর বাস্তবতার মাঝখানে সেই সেতু আমাদের ভেতরে এক অদৃশ্য আলো জ্বালিয়ে দেয়।

আমরা দুজনই সেই প্রবাহে ভেসে যাই। প্রতিটি নিশ্বাস কথার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, প্রতিটি দৃষ্টি একেকটি অদৃশ্য কবিতা হয়ে ওঠে। কবিতার ভেতরেই আমরা বুঝতে পারি– জীবন মানে শুধু দায়িত্ব নয়; চুপচাপ, নিঃশব্দে, দৃশ্যহীনভাবেও জীবনকে প্রেমময় করে তোলা যায়। শিশুটি আমাদের মাঝে শেষ সেতু তৈরি করে দেয়, সেই সেতু পেরিয়ে প্রেম, দায়িত্ব, স্মৃতি আর বাস্তবতা এক দীর্ঘ, শান্ত নদীতে মিলিত হয়। আমরা জীবন হয়ে, অনুভূতি হয়ে, নীরব এক অনন্ত প্রতিফলন হয়ে ভেসে যাই।

গল্পে গল্পে শীত

আতিক রহমান

ও দাদু, দাদু কোথায় গেলে তুমি? এই তো দাদু ভাই, আসছি। সানবীর ডাকে সাড়া দেয় তার দাদু। সানবীকে গতকাল দাদু কথা দিয়েছিল একটি গল্প শোনাবে। তাই সে সকাল থেকে দাদুর পিছু পিছু ঘুরছে। কিন্তু দাদু তাকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করছিল। সানবীর সতর্ক দৃষ্টি তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে।

এই যে, দাদু, কী পালিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল। হ্যাঁ, বেশ তো ফাঁকিবাজি শিখেছ। কেন, তোমার মনে নেই আমার কথা?

– ও তাই তো, আমি তো একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। বয়স তো কম হলো না। সাতাত্তরে পা দিয়েছি নতুন বছরে।

হ্যাঁ দাদু, ভুরু কুঁচকে বুক ফুলিয়ে বলল সানবী। যেন গর্বের কথা।

– রাখো তো তোমার বয়সের কথা। কিছু হলেই এ কথা বলো। হাতে ঘড়ি রেখে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকো। চোখে চশমা, আর জিজ্ঞাস করো, দাদু ভাই- চশমাটা লুকিয়ে রেখেছিস। তোমার এসব কাণ্ড দেখলে কার না হাসি পায়?

– চুপ করো দাদু ভাই, চুপ করো। লোক শুনিয়ে লজ্জা দিলে। এ সবই বুড়ো হওয়ার ফ্যাসাদ। বুঝলি এ জন্যই তো কেউ বুড়ো হতে চায় না।

– কে বলছে দাদু, তুমি বুড়ো। তুমি তো সাতাত্তর বছরের তরতাজা যুবক। কাজেই এবার ওসব ফ্যাসাদের কথা রেখে আমার যুবক দাদুর মুখে গল্প শুনতে চাই।

– তা বেশ তো। বলো কীসের গল্প শুনবে?
– শীতের উপর দাদু, শীতের উপর।

– বলবো। তবে, তার আগে আমার এই ছড়াকারের শীতের উপর লেখা ছড়ার ক'টি লাইন শোন–

শীতে সবার কাশি বাড়ে
কারো কারো হাসি বাড়ে
আমার বাড়ে হাঁচি,
ওরা বলে- খালি পায়ে
বস্ত্র ছাড়া খালি গায়ে
কেমন করে বাঁচি?

দাদুর ছড়া বলা শেষ হতেই সানবী প্রশ্ন করে– আচ্ছা দাদু, ওরা কারা?

– ওরা, ওরা হলো গরিব-দরিদ্র-অসহায়। যাদের পায়ে তোমার মতো দামি জুতা, দামি কাপড় তো দূরের কথা। কমদামি সেন্ডেল, মোটা কমদামি কাপড়টুকুও নেই। আর তোমার মতো যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে পৃথিবীর মুখ দেখেছে তাদের কাশি-হাঁচি বাড়লেও বেশি বাড়তে পারে না। কারণ প্রয়োজনে হাতের কাছে ওষুধ থাকে। তাই কাশির চেয়ে তোমাদের হাসিই বাড়ে বেশি। আর ওদের? ওদের কাশি-হাঁচি দুটোই বাড়তে থাকে। সেই সাথে শীতের হিমেল হাওয়া তাদের আরো কাতর করে। যেমনটি করে ক্ষুধার জ্বালা। তাই তো ওরা চিৎকার করে বলে– রোগের জ্বালায় কেমন করে বাঁচি?

– দাদু তুমি কিন্তু একাই বলছো আর বলছো। বলছিলে শীতের গল্প শোনাবে। আর তুমি কি-না ছড়ার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছো!

– এরচেয়ে সুন্দর প্রাণবন্ত মহৎ গল্প তোমাকে কে শুনাবে, বলো, দাদু ভাই।

– ধুর, এ আবার গল্প হলো নাকি। গল্প হলে তো শুনতেই ইচ্ছে হতো।

– ঠিক আছে, এবার নিখাঁদ খাঁটি গল্প বলছি। বলছি না ঠিক! গল্প করছি। জানিস সানবী তোর দাদি বেঁচে থাকতে আমাকে শীতের দিনে কত রকমের পিঠা বানিয়ে খাওয়াতো। আর তোর দাদির হাতের পিঠার স্বাদও ছিল ভিন্ন।

– আচ্ছা দাদু, তোমার প্রিয় পিঠা কী?

– কলি, ভাপা, পাটিসাপটা ইত্যাদি। তবে খেজুর রস সংগ্রহের একটা ঘটনা বলি। রসের কলসি খেজুর গাছ থেকে পারতে গেলাম কিন্তু কলসি নামাতে গিয়ে কেউ ধরতে পারলাম না। হঠাৎ তখনি ঘটল দুর্ঘটনাটা! সে কথা ভাবতে আজও দুঃখ-হাসি দুটোই পায়!

– ও দাদু কী ঘটল? তাই আগে বলো।

– কী ঘটবে আবার। বাড়াবাড়ি করলে যা হয়! আকস্মিকভাবে মহসীনের হাত থেকে দড়িটা ফসকে গেল, সাথে সাথে কলসিটাও মাটিতে কুপোকাত! কুপোকাত মানে ক'খণ্ডে ভেঙে গেল। কলসিটাও যেন তখন আমাদের মহসীনকে বলল উঠতে। আমিও তার সাথে বললাম, মহসীন রাজি হয়ে গেল।

– আচ্ছা দাদু, তুমি দড়ি নিয়েছিলে কেন?

– আরে শোন, সে কথাও বলছি। মহসীন গাছে উঠল। আমি দড়িটা ওর হাতে দিলাম। ও রসভর্তি ছোটো লাল কলসির গলায় দড়ির একমাথা বেঁধে আরেক মাথায় ধরে আস্তে আস্তে কলসটা নীচে নামাতে লাগল। আমি বুদ্ধি আঁটলাম, কলসিটা আগে ধরতে পারলে কাঁধে নিয়ে দিবো বাড়িতে দৌড়। ওরা কী ভাবছিল জানি না। কিন্তু ওরাও আমার সাথে কলসিটা ধরার জন্য লাফালাফি করতে শুরু করল। আর গাছ থেকে মহসীনও মজা করছে কলসিটা একবার উপরে তুলছে আবার নীচে নামাচ্ছে। কয়েক মিনিট এভাবে আমরা লাফালাফি করলাম কলসিটা ধরার জন্য। কিন্তু কেউ ধরতে পারলাম না। হঠাৎ তখনি ঘটল দুর্ঘটনাটা! সে কথা ভাবতে আজও দুঃখ-হাসি দুটোই পায়!

– ও দাদু কী ঘটল? তাই আগে বলো।

– কী ঘটবে আবার। বাড়াবাড়ি করলে যা হয়! আকস্মিকভাবে মহসীনের হাত থেকে দড়িটা ফসকে গেল; সাথে সাথে কলসিটাও মাটিতে কুপোকাত! কুপোকাত মানে ক'খণ্ডে ভেঙে কলসিটাও যেন তখন আমাদের তিরস্কার জানালো। রসগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। একফোঁটা রসও কারো ভাগ্যে জোটেনি। হায়রে কপাল! এ জন্যই গুণীজনরা বলে গেছেন– 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট', 'লোভে পাপ-পাপে মৃত্যু'। আরো কত কী!

– সত্যি দাদু অতি লোভ করতে নেই। তাই তো আমার কোনো লোভ নেই।

– কী বললি দুষ্টু কোথাকার! তোর লোভ নেই। বাড়িতে কেউ মিষ্টি আনলে কাড়াকাড়ি-মারামারি করিস কেন? হ্যাঁ, তোর যদি লোভই না থাকে তাহলে মিষ্টি নিয়ে রাজীবের সাথে ঝগড়া করিস কেন?

– বারে! আমি ঝগড়া করি না কি? রাজীব ভাইয়াই তো...।

– থাক, থাক, হয়েছে দাদু ভাই আর সাধু ভাই সাজতে হবে না। তুমি যে কেমন ভালো তা আমার অজানা নয়।

থাক ওসব কথা। শোন, তোর মতো যখন আমি কিশোর ছিলাম, তখন কত কী কাণ্ড ঘটিয়েছিলাম; যার বেশির ভাগই মনে নেই। হায়রে আমার গাঁ। দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে দাদু বলতে লাগলেন, ছোটোবেলায় যে গাঁয়ের মাটিতে খেলেছি, সরু খাল-বিলে মাছ ধরেছি, ডুবোডুবি করে কত কী খেলা খেলেছি, সমস্ত গাঁ'কে মাতিয়ে রেখেছি– সে গাঁয়ে আজ আমি বছরে দু'একবার যেতে পারি না, শীতের দিনের পিঠা শহরেই খাই, গাঁয়ে খাওয়া আর হয় না। আমাদের আজ গাঁয়ের প্রতি যেন আর সেই মমতা নেই। নেই ভালোবাসা বন্ধন। আছে অবহেলা।

– কিন্তু কেন? গাঁয়ের আম গাছের লাল টুকটুকে আম কি আমরা ভালোবাসি না, খেয়ে থাকি না?

ওখানেই খাল-বিল-পুকুরের তাজা মাছ কি আমরা সবার আগে পছন্দ করি না? নবান্নের নতুন চালের ভাত, পিঠা কি আমরা খাই না? যদি গাঁয়ের এগুলোকে পছন্দ করে খেয়েই থাকি, তবে কেন গাঁকে আমরা ভালোবাসতে পারবো না? গাঁয়ে যেতে আমাদের কেন মন চাইবে না?

সানবী অবাক হয়ে এক নজরে দাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইল এবং দাদুর কথা শেষ হতেই ও বলল, দাদু আমি কিন্তু গ্রামকে ভালোবাসি। গ্রামে যেতে চাই। কিন্তু আব্বু-আম্মুই তো আমাকে যেতে দেন না। নিয়েও যান না।

– নিয়ে যাবে দাদু ভাই, নিয়ে যাবে। যেদিন এ শহরের কালো ধোঁয়া ওদের জীবননাশের কারণ হবে। তিক্ত লাগবে যান্ত্রিক জীবন। সেদিন ওরা গাঁয়ে যাবে। শীতের দিনে শীতের পিঠা বানিয়ে খাবে নিজ হাতে। শীতের ভোরে ক্ষেতের আলের শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটবে। যেমনটি হেঁটেছিল ছোটোবেলায়।

– ও দাদু, তুমি কিন্তু শীতের গল্প শোনাওনি! শীতের গল্প করতে গিয়ে অন্য বিষয়েও চলে গেছ।

শীতকে ঘিরেই ঘটনা ঘটেরে। আরেও, ধুর বোকা। শীতের দিনে কি শুধু শীতের ঘটনা ঘটে? কত কী ঘটনা ঘটে থাকে, ঘটে যায়।

– ও আল্লাহ! দাদু আমার তো স্কুলে যাবার সময় চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি এক্ষুণি আমাকে স্কুলে যেতে হবে। চলি দাদু। কাল কিন্তু আলাপচারিতার গল্প নয়, হ্যাঁ-মনে থাকে যেন দাদু। সত্যিকারের শীতের গল্প বলবে। কোনো কাহিনি বা ঘটনা নয়।

– হো হো হো। ঠিক আছে দাদু ভাই, ঠিক আছে। আল্লাহ বাঁচালে সে কাল দেখা যাবে।

রইলো নিমন্ত্রণ

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

পল্লি গাঁয়ের ছেলে আমি– পল্লি গাঁয়েই বাস
ক্ষেত-খামারে কাজ করে, কাটাই বারোমাস।
সকাল হতে সন্ধ্যে আমি– থাকি ক্ষেতের মাঝে
চাষ করে ক্ষেতে কাটাই, ব্যস্ত নানান কাজে।

বাড়ির পাশে সবজি ক্ষেতে– করি আলুর চাষ
তাতে ফলাই মূলা-বেগুন, আরও যে ফরাশ।
ঘরের পিছে মাচায় ফলাই– উচ্ছে পটল লাউ
কত ফসল ফলে ভাই, আমার সোনার গাঁও।

পুকুর ঘাটে চাষ করি– বোয়াল কাতলা রুই
আরও কত মাছ আছে, শিং মাগুর ও কই।
এই পুকুরে আছে অনেক– ছোট বড়ো মাছ
টেংরা, পুটি, শোল মাছের দেখতে যদি নাচ।

বাড়ির পাশেই ফলের বাগান– ফলাই কত ফল
আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আরও আতাফল।
ফলফলাদির অভাব নেই– ফলে বারোমাস
ফলের রসের মিষ্টি গন্ধে, পুরে মনের আশ।

এই করেই দিন কেটে যায়– মুখে নিয়ে হাসি
গাঁও গেরামে থাকি আমি, পল্লি ভালোবাসি।
আমরা থাকি ন্যাড়ার ছাউনি– ছোট্ট কুঁড়েঘরে
তোমরা থাকো দালানকোঠায়, কত আরাম করে।

এসো বন্ধু, আসবে তুমি! –আমার পল্লিগাঁয়ে
দেখবে কত আদর-যত্ন, করে আমার মায়ে।
আমার বাড়ি এসো বন্ধু- করবে না ভাই হেলা
আসলে দেখবে কাটবে সুখে, সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

পল্লি গাঁয়ের ছেলে আমি– পল্লি গাঁয়েই থাকি
সবুজ গাঁয়ে আসলে তোমার, জুড়িয়ে যাবে আঁখি।
গাঁয়ের মানুষ হলেও আমরা– তোমার আপনজন
পল্লি গাঁয়ে আসার জন্য, রইলো নিমন্ত্রণ।

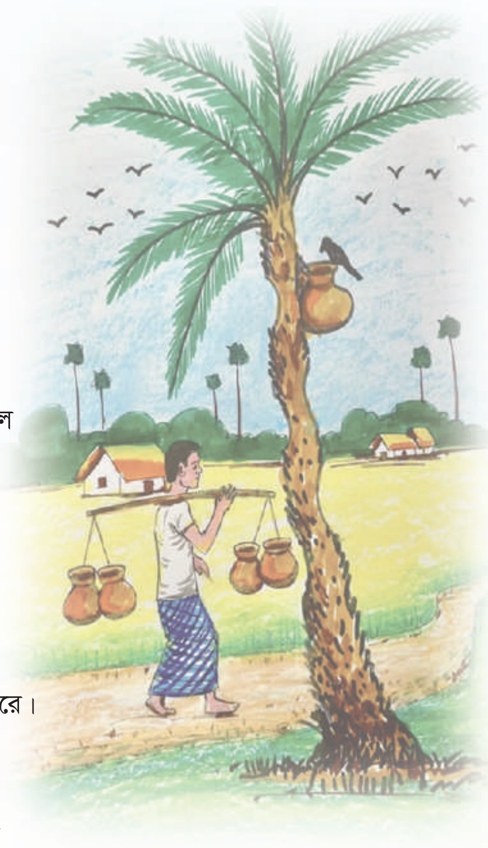

গাছ লাগাও

আবু রুশদা

চতুর্দিকে গাছ কেটেছ
বন করেছ শেষ!
বেশি বেশি গাছ লাগিয়ে
বাঁচাও পরিবেশ।

তাপ বেড়েছে গরমকালে
গাছপালা খুব কম,
রোদের তাপে দেশটা যেন
মরুর উপক্রম।

আর কেটো না গাছপালা ও
আর কেটো না বন,
ওরা হলো বন্ধু সবার
ওরা বড়ো ধন।

রসের হাঁড়ি

রাকিবুল ইসলাম রাহান

শীতকালেতে খোকা দেখে
খেজুর রসের হাঁড়ি,
বাবা আনেন সবার আগে
ভোরে গিয়ে বাড়ি।

খোকা দেখে গাছের পাতা
হলুদ হয়ে ঝরে,
ঠান্ডা হাওয়া শনশনিয়ে
উঠোন জুড়ে ঘোরে।

রোদ উঠেছে ঐ গগনে
সবার মুখে হাসি,
শীতের দিনে রোদ পোহাতে
সবাই ভালোবাসি।

দাদুর সাথে গল্প শুনি
আগুনটা পোহাতে,
গরম জলেতে স্নান করি
লেপটা মুড়ি রাতে।

সম্প্রীতির মায়াডোর

মেহেরুন ইসলাম

ভাসছি, ডুবছি বানের জলে
তবুও আছি সুখে,
মিলেমিশে বসত করি
মা-জননীর বুকে।

সকল বিপদ রুখতে জানি
বীরের মতো লড়ে,
একই মায়ের কোলে ঘুমাই
গলাগলি ধরে।

দুখের দিনে পাশে দাঁড়াই
কাঁধে রাখি কাঁধ,
এইতো আমার সোনার বাংলা
মমতা অগাধ!

সম্প্রীতির ওই মায়াডোরে
পড়ছি দারুণ বাধা,
হিন্দু, মুসলিম একপাতে খাই
ডাকি ভাইয়া, দাদা।

সন্ধ্যা-সকাল দেখা-সাক্ষাৎ
আলাপ জনে জনে,
পাকাপোক্ত প্রীতির বাঁধন
থাকবে প্রতিক্ষণে।

ষড় ঋতুর বাংলাদেশ

বাবুল তালুকদার

ষড়ঋতুর দেশ আমার সোনার বাংলাদেশ
প্রকৃতির এই দেশ পেয়ে ভালো আছি বেশ।
জন্ম আমার এই মাটিতে সবুজ-শ্যামল ঘিরে
উন্নত দেশ বাংলা আমার মানুষ ও উচ্চ শিরে।

মা ও মাটির বাংলা আমার অনন্তকাল থাকি
মানবতার হৃদয় দিয়ে মানুষ ভালো রাখি।
বাংলা আমার ঘিরে আছে নদ-নদী খাল-বিল।
সুখে দুখে থাকছে মানুষ হাসেও খিলখিল।

রক্তে ঝরা বাংলা আমার পায় না মানুষ ভয়
গর্ব বাংলাদেশের বিশ্ব করি জয়।
রংধনুতে ভরা আমার সোনার বাংলার মাটি
সারা বিশ্বের মাঝে আমার মাতৃভূমি খাঁটি।

শীতের আমেজ

কাজল নিশি

শীতের আমেজ মধুর করে
কাঁচা খেজুর রসে,
দাদা-ভাইয়া রস খেয়ে নেয়
গাছের নীচে বসে।

শীত মানে গায় অলসতা
চোখে গভীর ঘুম,
গাঁও-গেরামে হরেকরকম
পিঠাপুলির ধুম।

শীতের পিঠা খেয়ে আহা
যায় জুড়িয়ে প্রাণ,
মহানন্দে খোকন সোনা
গায় দেশেরই গান।

প্রকৃতির বিলাপ

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

কেন তুমি চলে যাচ্ছ শীত! বলে যাও
রেখে যাচ্ছো কেন তবে এত হিম স্মৃতি
নিশির শিশির হয়ে ঝড়ে ছিলে কেন
কোমল সবুজ-শ্যাম ঘাসের উপর?

আদর করে সূর্যকে কুয়াশার লেপে
ঢেকে কেন রেখেছিলে সকাল-দুপুর
জোনাকির আলো হয়ে কেন জ্বলেছিলে
ডুবে দিয়েছিলে কেন চাঁদের কিরণ?

ঘরের কোণায় আর আঙিনার পাশে
কেন তবে ফুটেছিলে গাঁদা, জুঁই রূপে
বৃক্ষ হতে পত্র হয়ে কেন ঝরেছিলে
দান কেন করেছিলে খেজুরের রস?

চলে যাবে যদি তবে অতিথির ছলে
কেন তুমি এসেছিলে আমার ভূ-গোলে?

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন প্রথিতযশা ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া

উষা রানি রায়

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত 'ছড়াসম্রাট' উপাধিতে ভূষিত সুকুমার বড়ুয়া ২রা জানুয়ারি ২০২৬ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহিরায় জে কে মেমোরিয়াল হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

সুকুমার বড়ুয়ার জীবন নাটকীয়তায় ভরা। সুকুমার বড়ুয়া ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার মধ্যম বিনাজুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম থেকে শহরে এসে সুকুমার বড়ুয়া জীবনযুদ্ধ শুরু করেন। কখনো গৃহকর্মী, কখনো বাবুর্চি এমনকি ফেরী করে বিক্রেতা হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সব কাজের ফাঁকে পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতেন। স্কুলে গিয়ে পড়া আর হয়নি সুকুমার বড়ুয়ার। তবে বই পড়া কখনো থামেনি তাঁর।

ষাটের দশকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে তোপখানা রোডে ছয় টাকায় বেড়ার ঘর ভাড়া করে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টোর কিপার হিসেবে অবসরে যান।

প্রায় ৬০ বছর ধরে ছড়া লিখে সুকুমার বড়ুয়া 'ছড়ারাজ', 'ছড়াশিল্পী', 'ছড়াসম্রাট' প্রভৃতি নানা অভিধায় অভিষিক্ত হয়েছেন। ব্যঙ্গাত্মক, হাস্যরসাত্মক, নৈতিক শিক্ষামূলক রচনার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর রাজনৈতিক বার্তাও তার লেখায় উঠে এসেছে। তাঁর ছড়ার বক্তব্য স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। ছন্দের ঝংকারে একবার পড়ার পরই মনে গেঁথে যায়। সত্য নিরূপণে, জনমত গঠনে ভূমিকা রেখেছে তাঁর ছড়া।

'পাগলা ঘোড়া', 'ভিজে বেড়াল', 'চন্দনা রঞ্জনার ছড়া', 'এলোপাতাড়ি', 'নানা রঙের দিন', 'চিচিং ফাঁক', 'কিছু না কিছু', 'প্রিয় ছড়া শতক', 'নদীর খেলা', 'ছোটদের হাট', 'মজার পড়া ১০০ ছড়া', 'যুক্তবর্ণ', 'চন্দনার পাঠশালা', 'জীবনের ভেতরে বাইরে' তার উল্লেখযোগ্য ছড়ার বই।

ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সরকার ২০১৭ সালে সুকুমার বড়ুয়াকে একুশে পদকে ভূষিত করে। এছাড়া বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সম্মাননা, অবসর সাহিত্য পুরস্কার, আনন ফাউন্ডেশন আজীবন সম্মাননা, চন্দ্রাবতী শিশুসাহিত্য পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি, ছড়াকার ও লেখক সুকুমার বড়ুয়ার মৃত্যুতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। আমরা তাঁর বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করি। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তাঁর ছড়াগুলো আনন্দ ও চিন্তার খোরাক জোগাবে। তাঁর ছড়ার মতোই তাঁর স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মাঝে।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 07, January 2026, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd